তবুও রমণী

পরেশ ভট্টাচার্য

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

স্নেহের
টুনি বসুকে
—দাদা

ঃ লেখকের কয়েকখানি বই ঃ

গুলশান

জঙ্গল পাহাড়ী

মাঝি

রঙমহল

মানস-গঙ্গার পথে

দুর্গম-সুন্দর

অমানুষ

নাম তার রূপসী

ওস্তাদ (ছোটদের)

দুপুরের পর।

দরজার চৌকাঠের কাছে মাদুর বিছিয়ে শুয়েছিলাম। হাতে ছিল একটা সস্তা দামের উপন্যাস। ক'দিন ধরে বেশ খানিকটা পড়েছি, ইচ্ছে ছিল বাকিটা আজ শেষ করবো। কিন্তু হলো না। উপন্যাসটা বুকের ওপর বন্ধ করে রেখে কখন যেন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম।

বেলা চারটে। তবু উঠে বসতে ইচ্ছে হলো না। বেশ তো শুয়ে আছি। নিজেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

মাথার ভিজে চুল ছড়ানো ছিল চৌকাঠের ওপরে। শুকিয়ে গেছে। উঠে বসে ছড়ানো চুলগুলো আলগা খোঁপায় জড়াবো সেটুকু ইচ্ছেরও অভাব।

কখনো চিৎ হয়ে ছাদের কোণে অসহিষ্ণু টিকটিকিটাকে দেখছি, কখনো ডান দিকে কাত হয়ে দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারের অদ্ভুত ছবিটাকে। ছবিটা একটি মেয়ের। বক্ষবাসের বিজ্ঞাপন।

কিন্তু বাঁ দিকে ফিরতেই শুয়ে থাকার ইচ্ছেটা উবে গেল।

এই মুহূর্তে খাঁচার টিয়াটা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে উঠলো। হয় ছোলা ফুরিয়েছে, না হয় তেষ্টা পেয়েছে। পাখির স্বভাবটাও বিদঘুটে, জলের বাটি নিজের ঠোঁট দিয়ে উল্টে নিজেই ট্যাঁ-ট্যাঁ করবে।

এবারে উঠতে হবে। আর শুয়ে থাকা যায় না।

ফাল্গুন মাসের প্রথম। সাড়ে পাঁচটা বাজতেই সন্ধ্যে হয়ে যায়। মধ্যে যেটুকু সময়, এরই মধ্যে সব। তারপর আর কি।

উঠে বসলাম। এলানো চুলের গোছা আলগা ভাবে জড়িয়ে মাথার ওপর চূড়ো করে ঠেলে দিলাম। আমার ছায়াটা সামনে— ছায়ার মাথাটা যেন শিবঠাকুর।

হাই ওঠেনি। তবু ইচ্ছে করে হাই তুললাম হাত দুটোকে ওপরের দিকে তুলে। দৃষ্টি গেল সামনে। যেখানে আরশির কাঁচে

আমার প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বের দিকে চোখ পড়তে মুহূর্তের জন্তে অন্যমনস্ক হলাম যেন। কিন্তু সে অন্যমনস্কতা কাটাতে দেরী হলো না।

এবারে উঠে পড়ি। মাদুর-বালিশটা জড়ো করে পা দিয়ে একপাশে ঠেলে দিই।

পশ্চিমের বারান্দায় শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া শুকোতে দেওয়া রয়েছে। তুলতে বারান্দায় এলাম। শাড়ি, সায়া তুললাম। কিন্তু ব্লাউজটা পেলাম না। নিচের দিকে ঝুঁকলাম। না, নিচের গলিতে পড়েনি। পড়লেও কেউ কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। যাক গে। আমার তো অনেক আছে। একটা হারিয়ে গেলেই বা। যার নেই সে গায়ে দিয়ে বাঁচবে।

বারান্দা থেকে ঘরে এলাম। আরো একবার আরশির সামনে দাঁড়িয়ে বাথরুমে ঢুকলাম।

এবার নিজেকে মুক্ত করার পালা। যদিও শীতের আমেজ, তবু গা না-ধুলে থাকতে পারি না। কলের নিচে বসে পড়ি। শুধু মাথার চুলগুলোকে বাঁচাতে হয়। তাও ভিজে যায় বৈকি।

কলটা খুলে দিলাম। কয়েকবার আঁজলা ভরে জল নিয়ে চোখে ঝাপটা দিলাম। তারপর কলের নিচে বসে পড়লাম।

এবার প্রসাধনের পালা। দামী সুগন্ধীর অনুলেপন সর্বাঙ্গে। তারপর পাউডার ছিটিয়ে ভিজে দেহটাকে শুকিয়ে নেওয়া।

বাথরুম-পর্ব চুকলো। সাধারণ আটপৌরে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে ঘরে এলাম। সামনের দরজা খোলা ছিল। বন্ধ করে দিলাম। সামনের বারান্দার দিকের জানালাটাও।

এবারে নিজেকে সাজানোর পালা। এ সময়টা নিজেকে পুরোপুরি বন্দী রাখতে আমার ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে তা বিশ্লেষণ করে দেখিনি। আমার এই খেয়ালের জন্তে অনেকেই হাসাহাসি করে। তাদের সঙ্গে আমিও হাসি। কিন্তু তা নিয়ে কথা বলি না।

আরশির সামনে এসে বসলাম। বেতের মোড়ায়। নিজেকে

একবার দেখলাম। শুধু শাড়িটা অঙ্গে জড়ানো। তাও তেমন করে নয়। আর লজ্জা পাওয়ার মতো কেউ তো এখানে নেই। নিজেকে দেখে নিজের তো লজ্জা হয় না। তবু তির্যক দৃষ্টিতে আরশির আমার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

প্রথমে চুল বাঁধার পালা। নতুন নতুন ধাঁচে কবরী রচনা করতে সাধ হয়। আজ এক রকম, কাল অন্যরকম।

বেণী বাঁধতে বসে মনে হলো, আজ নাই-বা বাঁধলাম বেণী। থাক না মাথার চুল এলানো। না হয়, আলগা খোঁপা বাঁধি। তাই বাঁধলাম। তবে সামনের চুলে চিরুনি চালিয়ে সিঁথি কাটতে ভুলিনি।

এরপর আরো মনে হলো, আজ যেমন আছি তেমনি থাকি না। নাই-বা আর সাজগোছ করলাম। চোখে কাজলরেখা টেনে লাভ কি। পেন্সিল দিয়ে ভ্রু-যুগলকে আরো স্পষ্ট না করলেও ক্ষতি নেই। এমনিতেই তো টানা-টানা ভ্রু।

টিপটা না আঁকলে নয়। নয়তো মুখটাকে কেমন শূন্য মনে হয়। আকাশের চাঁদ যেমন, মেয়েদের টিপ তেমন। আকাশে চাঁদ না উঠলে নক্ষত্র ওঠে, এখানে তেমন নয়। টিপটাই দুই পক্ষের চাঁদ কিংবা নক্ষত্র।

সযত্নে টিপ আঁকলাম দুই ভ্রু-র মাঝখানে। একটু বড় করে। তারপর সিঁথিটার দিকে তাকাই। সিঁথিটা আমার শূন্যই থাকে। প্রথম প্রথম কিন্তু তেমন থাকতো না। বরং পুরনো দিনের স্মারক-চিহ্নটা আঁকাই থাকতো। সেই যে বছর খানেক আগে একদিন শ্যাম্পু করে আরশির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, তারপর সেই যে মনে হয়েছিল—আর নয়, এ সিঁথি সাদাই থাকবে—সেই থেকে সীমন্ত-সরণি আর রক্তিম করিনি।

পাঁচটা বেজে গেছে।

শাড়ি-ব্লাউজ বদলে নিয়েছি। হাল্কা কমলা রঙের মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি, আর রঙ মিলিয়ে ব্লাউজ। এবারে আলগা খোঁপায়

বেলকুঁড়ির মালা জড়িয়ে রামকৃষ্ণদেবের পটের সামনে দাঁড়ালাম প্রণামের জন্যে। প্রণাম করলাম। প্রার্থনাবিহীন প্রণাম। ধূপ জ্বালিয়ে দিলাম পটের সামনে। পটের ওপর একটা আগন্তুক মাকড়সা জাল বুনেছিল, পরিষ্কার করে দিলাম। মাকড়সাটাকে মারতে চেয়েও মারলাম না। পটের পিছন দিকে চলে গেল।

সন্ধ্যার বাতিটা জ্বেলে দিলাম। সেই সঙ্গে একশো পাওয়ারের বালবটাও। ঘরটা হঠাৎ আলোয় ঝলমল করে উঠলো।

এবারে দরজা খোলার পালা। দরজা খুলি—কিন্তু চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দরজায় মাথা রেখে দাঁড়াই না। ওটাতে আমার আপত্তি। নিজেকে বিকিয়েছি বলে মর্যাদা হারাতে রাজী নই। চোখ-ইশারায় শিকার করতেও চাই না। যে পতঙ্গ মরবে, সে আপনা থেকেই প্রদীপে এসে ঝাঁপ দেবে।

আর এই সবের জন্যে এ বাড়িতে আমার নামে এত কথা। কত কি বলে, তবে সবই পিছনে। সামনে নয়। সামনে কেউ কিছু বলে না। বরং আমাকে খোশামোদ কিংবা তোষামোদ করেই খুশি হয় তারা। অনেক সময় তারা এমনও বলেছে, আমি নাকি এ বাড়ির মক্ষিরানী। কিন্তু কারো কোন কথায় আমার যায় আসে না।

আর কিছু থাক না থাক, কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখি আমি। স্রোতে গা ভাসিয়ে মাঝে মাঝে বিপরীতে চলতে আমার ইচ্ছে হয়। আমার ইচ্ছার মূল্য আমার কাছে। অন্যের কাছে তার মূল্য প্রার্থনা করি না।

নিজের কথা বলতে কার না ইচ্ছে হয়। অন্তত সেই ইচ্ছার তাগিদেই বলছি, কিছুটা লেখাপড়া শিখেছিলাম আমি। বাংলা, ইংরেজী লিখতে-পড়তে পারি। গানেও গলা আছে, তাছাড়া আমার রূপেও ঘাটতি নেই। রূপসী না হলেও রূপবতী। আর বয়েস? পঁচিশ পেরিয়ে গেলেও, মনে হবে একুশ কি বাইশ। গাছ-কোমর বেঁধে বেণী ঝুলিয়ে থাকলে বয়সটা আরো নেমে যায়।

সন্ধ্যে হয়েছে।

দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। এ দাঁড়ানোর মধ্যে অন্য কিছু নেই। শুধু বাইরের বাতাসে একটু নিশ্বাস নিতে আগ্রহ।

সন্ধ্যের পর থেকে এ বাড়ির চেহারা যেন বদলে যায়। রূপের হাট জমজমাট হয়ে ওঠে। দেহটাকে পসরা করে নিজেকে বিকোনোর চেষ্টা। বিজ্ঞাপন সাঁটা কটাক্ষে, পোশাকে, হাসিতে, কথায়।

আর আমি!

আমি চাই না ওদের মতো হতে। ওরা দেহের সঙ্গে মনটাকেও পিষে ফেলেছে।

কিন্তু আমার মন আমাতেই আছে। আমি এখনো ভাবতে পারি, মালা বিশ্বাস নামে মেয়েটা এখনো তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। কলকাতার অন্ধগলির আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে সে এখনো ভাবতে পারে, রূপনারায়ণের ধারে মাধুকরী গ্রামের রাসখোলার কৃষ্ণচূড়া গাছটায় ফুল ঝরে পড়ছে। আর মেয়েটা আঁচল ভরে সেই ফুল কুড়িয়ে নিচ্ছে। মালা বিশ্বাস আরো ভাবতে পারে রূপনারায়ণের পারে দিনের সূর্য কেমন সমারোহ করে অস্ত যায়। সে সূর্য এখানে এই ইট-পাথরের শহরে দুর্লভ।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গ্রামের সেই কৃষ্ণচূড়ার কথা ভাবছিলাম। যে কথা স্বপ্নের মত মনে হয় আজ।

যদিও স্বপ্ন হারিয়ে যায়, কিন্তু স্মৃতি হারায় না। বেঁচে থাকে মনের মণিকোঠায়। স্মৃতি আমার কাছে ঐশ্বর্য, সম্পদ। আমি বেঁচে আছি, বেঁচে থাকবো। পাপ-পুণ্যের পৃথিবীতে আমার কাছে আনন্দটাই সত্যি। বলতে পারি, আমার আনন্দ হারায় নি।

তবু মাঝে মাঝে কান্না পায় বৈকি। সেটা আর কিছু নয়—মানসিক যন্ত্রণার প্রকাশ। যে দেহটা আশ্রয় করে আমার মন রয়েছে, সেই দেহটাকে আমার মন সহ্য করতে পারে না। তবুও সযত্নে সেই দেহটাকে লালন করতে হয়। এই যে দেহ-মনের দ্বন্দ্ব,

যন্ত্রণার উৎস সেখানেই।

এই যন্ত্রণার মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাই না আমি। কান্নার সমুদ্রে ভেসে যাই না। আর সেই জন্যেই তো বলতে পারছি, আমি বেঁচে আছি, বেঁচে থাকবো।

তবুও একটা 'কিন্তু' এসে জড়িয়ে থাকে মনের মধ্যে। একটা প্রশ্নও আসে, সত্যিই আমি বেঁচে আছি কি না।

আমি চলছি, ফিরছি, কথা বলছি, খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি—এতেই কি বেঁচে থাকা বোঝায়? না কি বাঁচার মানেটা অন্য রকম?

এই তো দেখছি বারান্দার দিকে দৃষ্টিপাত করে, অনেকগুলো নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের নামও আমি জানি। রীতা, শান্তি, অনু, দোয়েলা, বকুল, পরী, এলা—আরো কত নাম। ওই নামের মেয়েগুলো কি 'বেঁচে আছি' এ দাবী করতে পারে।

যখন ওদের সঙ্গে নিজের নামটা যোগ করে নিয়ে জীবনের কথা ভাবি, তখন আমার মধ্যেও প্রশ্ন আসে, আমি বেঁচে আছি কি না।

কিন্তু যখন মাধুকরী গ্রামের কৃষ্ণচূড়ার স্বপ্ন দেখি, তখন আমার মধ্যে মালা বিশ্বাস নামে সেই মেয়েটাকেই খুঁজে পাই, যে আঁচল ভরে কৃষ্ণচূড়ার ফুল কুড়িয়ে ফাল্গুন মাসের সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরতো।

—মালা।

হঠাৎ চমক ভাঙলো। কুমার চৌধুরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণচূড়ার স্বপ্ন হারিয়ে গেল।

কুমার চৌধুরী সবৃন্ত বশরাই গোলাপ এনেছে আমার জন্যে, তাই হাত পেতে নিলাম।

গোলাপের ঘ্রাণ নিলাম। মিষ্টি সুরভি জড়ানো গোলাপ। সবে পাপড়ি মেলেছে। হয়তো একটু আগেও ছিল অনাঘ্রাত।

আমার কোমল আঙুলের স্পর্শ দিলাম গোলাপের পাপড়িতে। তারপর ইচ্ছে হলো চুম্বন দিই। না থাক। আমি ভ্রমর নই। অতখানি ভালো নয়। হয়তো বাড়াবাড়ি ঠেকবে কুমার চৌধুরীর কাছে। ও থাকতে গোলাপ। হয়তো ওর পুরুষ-সত্তা আহত হবে।

এমনি তো কুমার চৌধুরী নিজেকে দস্তুরমত জাঁদরেল পুরুষ বলেই আমার কাছে পরিচয় দেয়। কিন্তু আমি জানি, ওর মধ্যে যে কাঙালপনা, এটা যে-কোন পুরুষের জীবনে বেমানান। অন্তত আমার কাছে এলে ওর পুরুষ সত্তা পঙ্গু হয়ে যায়। নয়তো ও বলতে পারে, তুমি আমার পৃথিবী মালা, তোমাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছি।

শুধু কি ওই একটি কথা, অনর্গল আরো কত কথা বলে যায়। সব কথাই আমাকে উদ্দেশ্য করে বলা। যার মধ্যে আমার স্তুতি ছাড়া আর কিছু নেই। একদিন সহ্য করতে পারিনি। বলেছিলাম ওর মুখের ওপর, তুমি কি পুরুষ মানুষ, না আর কিছু? আমার প্রশস্তি ছাড়া কিছু জানো না তুমি?

সেদিন আমার কথায় আহত হয়েছিল কুমার চৌধুরীর পুরুষ-সত্তা। ওর মুখের রেখাগুলো দেখেই সেটা বুঝেছিলাম। কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বলেনি।

তারপরেই কেমন যেন করুণার ভাব এসেছিল মনে। কুমার চৌধুরীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলেছিলাম, না না—তুমি রাগ কোরো না আমার ওপর। আমি জানি, আমার কাছে এলে তুমি আমাতে বিলীন হয়ে যাও। আমি যে তোমার কাছে সমুদ্র। তুমি ডুবুরির মত আমার গভীরে মুক্তার সন্ধান করো—তাই না?

আমার কথার সেই মুহূর্তে কুমার চৌধুরীর দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

গোলাপগুলো হাতে নিয়ে সেদিনের কথা ভাবতে ভাবতে হয়তো একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

—কি ভাবছো?

আবার বর্তমানের মুহূর্তে ফিরে এলাম কুমার চৌধুরীর অনুচ্চ-কণ্ঠের জিজ্ঞাসায়।

—তোমার কথা।

—না, মিথ্যে বলছো। তুমি অন্য কিছু ভাবছিলে।

—না গো না।

—সত্যি বলছো ?

—তোমার কাছে কি আমি মিথ্যে বলি ? আর শুধু তোমার কাছে কেন, কারো কাছে আমি মিথ্যে বলি না। বলতে চাই না। আর চাইলেও পারি না।

আচমকা শব্দ শুনে চুপ করে গেলাম। পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে এলা আর রীতা হাসাহাসি করছে। হয়তো আমাদের কথা ওদের কানে গেছে।

ঘরে এলাম। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে। বশরাই গোলাপগুলো বিছানার ওপর রেখে বললাম, তবে সত্যিটাও অনেক সময় মিথ্যে হয়ে যায়। সেখানে তো আমার হাত নেই।

কথার শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলাম। জানি, আমার এই মুহূর্তের কথার সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস জড়িয়ে দেবার কোন যুক্তি নেই ; তবু নিশ্বাসটা দীর্ঘ হয়েই পড়েছিল। হয়তো খানিক আগেও যে চিন্তা করছিলাম, কুমার চৌধুরী এখানে আসার আগে, সেই চিন্তাটা মনের গোপনে জড়িয়ে ছিল, আর তারই জন্যে এই দীর্ঘ-নিশ্বাস।

—তুমি অন্য কিছু ভাবছো। কুমার চৌধুরী এবারে আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। বললে, সত্যি বলো না, কি ভাবছো মালা ?

—সত্যি বলছি, তোমার কথাই ভাবছিলাম।

কুমার চৌধুরী ঝুঁকে পড়লো আমার মুখের ওপর।

হঠাৎ কি মনে হলো, খেয়ালবশেই বলে ফেললাম, আমাকে কয়েকদিনের জন্যে আলো-বাতাসের পৃথিবীতে নিয়ে যাবে কুমার ?

কুমার বিস্ময়-জড়ানো দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে ফিরে তাকালো। বুঝতে পারি, ওর দৃষ্টিতে এ বিস্ময় কেন ? আবার এ কথাও জানি, মনের মধ্যে ওর যতই বিস্ময় জাগুক, যতই কৌতূহল থাকুক, তবু ও 'মালা তোমার এই ইচ্ছে কেন'—বলে অহেতুক জেরা করতে চাইবে না। বরং বলবে, বেশ তো, বলো কোথায় যাবে মালা, বলো—কোথায় যেতে চাও তুমি ?

সত্যি, যা ভেবেছিলাম তাই বললে কুমার। তবে আমি কে

ভাষায় ভেবেছি, সে ভাষায় নয়। বললে, তুমি কি অন্ধকারের রাজ্যে বাস করছো মালা?

—না না, সে কথা আমি বলতে চাইনি।

—তবে? কুমার দুহাতের বন্ধনে আমাকে বুকের মধ্যে জড়ালো। আমার কথার অপেক্ষা না করেই সে বললে, তুমিই বলো—কি ইচ্ছে তোমার?

বললাম, সমুদ্র দেখতে ইচ্ছে করছে।

—সমুদ্র?

—হ্যাঁ, সমুদ্র। যেখানে তুমি আমি দুজনে মিলে দিনের-পর-দিন ঝিনুক কুড়োব। যেখানে তুমি আর আমি বালির ওপর বসে সমুদ্রের ঢেউ গুনবো।

আমার কথা শুনে কুমার হাসলো। অথচ হাসার মত কিছুই বলিনি আমি। তবে আমার কথার মধ্যে একটু কবিতার ব্যঞ্জনা ছিল। ওটা আমার স্বভাব। কথায় অলঙ্কার মিশিয়ে বলতে আমার ভালো লাগে। যদিও যার কাছে বলছি, এই কুমার চৌধুরী, ওর কাছে কবিতাই বা কি, আর অলঙ্কারই বা কি। সূক্ষ্ম রসবোধ বলে ওর কাছে কিছু নেই।

কুমারকে নীরব দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, কি, চুপ করে রইলে কেন? সমুদ্র দেখতে যাবে না?

—বেশ তো যাবে।

—তার মানে, তুমি যাবে না?

—যাবো।

—কবে যাবে?

—তুমি যেদিন যেতে চাও।

—যদি বলি আজই?

—আজ তো যাওয়া সম্ভব নয়।

—কেন, পুরী এক্সপ্রেস এখনো তো হাওড়া স্টেশন ছেড়ে চলে যায়নি।

—তা যায়নি সত্যি, কিন্তু আজ কি যাওয়া সম্ভব? ঘড়িতে সময় দেখে কুমার চৌধুরী বললে, এক্ষুনি যদি বেরিয়ে পড়া যায়, হয়তো ট্রেন ধরা যাবে, কিন্তু তুমি পারলেও, আমি এখন বেরোতে পারবো না।

—আজ না হয় নাই হলো, কিন্তু কাল?

—তুমি বললে তাই হবে।

মনে মনে আনন্দ পেলাম বৈকি। পুরী যাবো, সমুদ্র দেখবো—অফুরন্ত আলো-বাতাসের পৃথিবীতে ক'দিনের জন্যে প্রাণটাকে মেলে দেবো—এ কথা ভাবতেও আনন্দ।

কুমারকে দুহাতে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বললাম, সত্যি বলছি – তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। আমি ভাবতেই পারিনি, তুমি এত সহজে রাজী হয়ে যাবে। কুমার, ঈশ্বর তোমার ভালো করবেন।

—এখানে আবার ঈশ্বরের কথা কেন?

—ও, ভুলেই গেছি। জানো, পুরী যাবো, সমুদ্র দেখবো—এ কথা মনে ভাবতে এত আনন্দ হচ্ছে, যে সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

—এত আনন্দ ভালো নয়।

—কেন? যেখানে তুমি আমি, সেখানে আনন্দের অভাব হবে কেন!

কথার শেষে কুমারের চিবুক স্পর্শ করলাম।

নিজেই বুঝতে পারছি আমার এই মুহূর্তের কথায় আচরণে বেশ কিছুটা অসঙ্গতি রয়েছে। থাক, জীবনের সবটাই যখন অসঙ্গত, তখন এটুকু অসঙ্গতি থাক না।

—কোথায় যেতে চাও? পুরী, গোপালপুর, না ওয়ালটেয়ার? দীঘা কিংবা বকখালি তো হাতের মুঠোয়, সেখানেও যেতে পারো।

—পুরী। আর শোনো, অনেকদিন থাকবো। যত দিন খুশি। এক মাস, দু মাস, কি তারও বেশী।

কুমার চৌধুরী এবারে কি যেন ভাবলো। তারপর চিন্তার সুর মিশিয়ে বললে, মালা, তুমি তো জানো আমার কত কাজ। আমি কি পারবো এতদিন কলকাতার বাইরে কাটাতে?

আমার দৃষ্টি তখন কুমারের মুখের রেখায়। বেশ বুঝতে পারি, আমার কথা ওর পছন্দ হয়নি। আর এই মুহূর্তে ওর মনের মধ্যে একটা বিরক্তিকর অস্বস্তি দানা বেঁধে উঠেছে। কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারছে না। পাছে আমি রাগ করি।

একবার মনে হলো হেসে উঠি। ওকে বলি, তুমি পারবে না কুমার আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে। তুমি পারবে না আমার সঙ্গে ঝিনুক কুড়ানোর খেলায় মাততে। কলকাতা ছেড়ে গেলে তোমার অনেক অসুবিধে। দিনে হাজার দেড় হাজার টাকা রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলাম না। বললে হয়তো ব্যথা পাবে। ওকে ব্যথা দিয়ে লাভ কি। স্থূল মানুষ ব্যথার দাম দিতে জানে না। কুমারকে তো জানি, এক্ষুনি কিছু বললে হয়তো আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠবে। কিংবা এই বাড়িরই আর কারো ঘরে গিয়ে আমার ওপর রাগ দেখাবে। তার চেয়ে ও যদি আমার সঙ্গে দুদিনের জন্যেও যায়, তাতেই আমি খুশি। এমন কি না-গেলেও। ও যদি চায় আমি ক'দিনের জন্যে একা কোথাও বেড়িয়ে আসি—তাতেও আমার আনন্দ।

আমার দৃষ্টি তখনো কুমারের মুখের রেখায়। যদিও উন্মনা আমি।

—কি? কুমার জিজ্ঞাসা করলে, অমন করে কী দেখছো আমার মুখের দিকে চেয়ে?

—তোমাকে। একটু নাটুকে ঢঙে বললাম, আমার কাছে কত সুন্দর তুমি। রোজ দেখি, অথচ নতুন করে দেখি। কুমার চৌধুরী আমার কাছে পুরনো হবার নয়।

কুমার এবারে আলতোভাবে আমার চিবুক স্পর্শ করলো। তারপর হাত দুটিকে নামিয়ে এনে রাখলো আমার কাঁধের ওপর। ও এই মুহূর্তে ওর স্পর্শে আমাকে উত্তপ্ত করতে চায়।

বুঝতে পারি সব কিছু। কোন কিছুই দুর্বোধ্য থাকে না। এবং নেই-ও। এরপর কি বলবে তাও আমার জানা। আজ একদিন তো দেখছি না ওকে। দেখছি অনেকদিন। তিন বছর। প্রতিটি রাত্রেই ও আমাকে সঙ্গদান করতে নয়, আমাকে সঙ্গিনী করতে আসে। সন্ধ্যে-রাতে আসে, আর গভীর রাতে চলে যায়। অনেক সময় যায়ও না। যেতে বললেও।

এই তিন বছরের রাতের কাহিনী—হাজার আরব্যরজনীর কাহিনী নয়, নিছক দুটি নর-নারীর যৌন-জীবনের কাহিনী। একজন রূপোপজীবিনী নারী, আর একটি নারীদেহলোভী পুরুষ। একজন কসাই—মাংস-বিক্রেতা, আর একজন তার পাইকার খরিদ্দার। হয়তো কুমার চৌধুরীর পুরুষ-সত্তা গর্ববোধ করে. যখন সে ভাবে নিষিদ্ধ গলির মক্ষিরাণী মালা বিশ্বাস তার রক্ষিতা—আর মালা বিশ্বাস কিন্তু অন্য কথা ভাবে। সে কথা নাই বা বললাম।

একটা বিলম্বিত নিশ্বাস বেরিয়ে এলো। এই মুহূর্তে নিজের মধ্যে যেন ভার বোধ।

ভেজানো দরজার অর্ধেক খুলে গিয়েছিল কখন। কুমার বন্ধ করে দিয়ে এলো। এসে বসলো খাটের একান্তে। গায়ের পাঞ্জাবি খুলতে গেল, কিন্তু খুললো না। কেন, ও-ই জানে।

কুমারের দিকে ফিরে তাকালাম। পাঞ্জাবির বোতামগুলো খোলা। হীরের বোতাম। আলোয় চিকচিক করছে। গলায় গেঞ্জির ওপরে সোনার হারটা আঁকাবাঁকা ছড়িয়ে রয়েছে। (পুরুষ-মানুষ হার গলায় দিলে কেমন যেন বোকা-বোকা লাগে। এঁড়ে গরুর মতো)

আমি জানি, যদি এখন কুমারকে বলি, তোমার ওই হারছড়াটি বেশ, শুধু বলবার অপেক্ষা, তারপরই ওর গলার হার আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলবে, এ হার তোমার গলাতেই মানায়। কিন্তু সে কথা বলতে অনিচ্ছা। না বলতেই অনেক হার দিয়েছে আমার

গলায় পরিয়ে। শুধু হার কেন, অনেক অলঙ্কারই পেয়েছি ওর কাছ থেকে। যেগুলোর বেশীর ভাগ রাখা আছে ব্যাঙ্কের সেফ ভল্টে। হয়তো তার দাম হিসেব করলে, বিশ-পঁচিশ হাজার কি আরও বেশী হবে।

যতই হিসেবী ব্যবসাদার হোক কুমার চৌধুরী, আমার কাছে এলে ওর সব হিসেব হারিয়ে যায়।

—কি খাবে? জিজ্ঞাসা করলাম, চা না কফি?

—কিছু না।

—সেকি!

—ইচ্ছে নেই।

—তোমার তো চা কিংবা কফিতে অরুচি হয় না। একবার বাঁকা চোখে তাকালাম কুমারের মুখের দিকে।—হয়তো মালা বিশ্বাসের ওপর থেকে তোমার রুচি চলে যাচ্ছে।

—মালা! আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো? কোনদিন তো এমন করে কথা বলো না?

কুমার দেহ এলিয়ে দিলে খাটের ওপর। কিন্তু দৃষ্টিটা রইলো আমার ওপর।

ইচ্ছে করেই পাশে একটা টুল টেনে নিয়ে বসলাম। কিছুটা তফাতে। ও যেন হাত বাড়িয়ে আমাকে স্পর্শ করতে না পারে।

—মালা, সত্যি তুমি পুরী যাবে?

—সত্যি নয়তো কি মিথ্যে বলছি। আমি কিন্তু সব গোছগাছ করে রাখবো। আর মনে থাকে যেন, কালই যাবো।

—বলছো?

—হ্যাঁ। আর শোনো, যে ক'দিন খুশি থাকবো। তুমি যদি চলে আসতে চাও, আসবে।

—মালা, তোমাকে পুরীতে রেখে আমি কলকাতায় এসে থাকবো, কথাটা ভাবতে পারলে? তুমি তো জানো তোমাকে ছেড়ে আমি একটা দিনও থাকতে পারি না।

—ভুল বললে, দিন নয় রাত।

—রাতটাই আমার কাছে দিন।

আমি না হেসে পারলাম না ওর কথায়। হয়তো কেন, ওর চোখ মুখ দেখে বেশ বুঝতে পারি, আমার হাসি ওর পৌরুষে আঘাত দিয়েছে। অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। শেয়ার মার্কেটে ওর যত দামই হোক না কেন, আমার কাছে ওর মূল্য কি? কিছুই না। এখানে ওর তো একটাই পরিচয়, আমার পোষা বাবু।

—জানো মালা, আজ একটা জিনিস তোমার জন্যে পছন্দ করে এনেছি।

কুমার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা মুখে দিলে। দেশলাইয়ের শিখার স্পর্শে সিগারেটটা জ্বললো। জ্বলন্ত কাঠিটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিলে। কিন্তু তার অর্ধ-সমাপ্ত কথা শেষ করলো না। আমিও কোন কৌতূহল প্রকাশ করলাম না।

কুমার আবার বললে, আমার কিন্তু জিনিসটা খুব ভালো লেগেছে।

বললাম, জিনিসটা কি শুনি?

—কি হলে তুমি খুশি হও?

—এই মুহূর্তে আমি কোন কিছুতে খুশি হবো না।

—নাঃ, তুমি বড্ড হেঁয়ালি করে কথা বলছো আজ। এমন তো বলো না।

আমি তবুও নীরব। শুধু একবার কুমারের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলাম।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো কুমার। বললে, আজ বিকেলের দিকে মিনার্ভা জুয়েলার্সে গিয়েছিলাম। চমৎকার জড়োয়া দেখালো। তোমার কথা মনে হলো সঙ্গে সঙ্গে। ভাবলাম, এমন জড়োয়া তোমার গলাতেই মানাবে। নিয়ে নিলাম।

তবু আগ্রহ প্রকাশ করলাম না জড়োয়া সম্পর্কে। বরং বললাম, তুমি যার কণ্ঠলগ্ন, সেখানে জড়োয়া কি হবে কুমার?

এবারে কুমার পকেট থেকে বার করলো জড়োয়ার আধার। বললে, মালা, দুচোখ বন্ধ করো—আগে আমি দেখবো এ জড়োয়ায় তোমাকে কেমন মানায়।

দুচোখ বন্ধ করলাম। কিন্তু জড়োয়া পরানোর মুহূর্তে আবার দুচোখ খুলে ফেললাম। জড়োয়ার দামী পাথরগুলো জ্বলজ্বল করছে। আরো দেখলাম, কুমার আমার গলায় সুন্দরভাবে পরিয়ে দিলে সে জড়োয়া।

এবারে নিবিড় হয়ে বসলাম কুমারের পাশে। আমার একটা হাত ছড়িয়ে ছিল ওর সামনে। সে হাতটা তুলে নিলে। আলতো-ভাবে টিপতে লাগলো আমার কোমল আঙুলগুলো।

আমার অনামিকায় জ্বলজ্বল করছে হীরের আংটি।

অনামিকার আংটির ওপর চুম্বন দিলে কুমার। একটু শিথিল কণ্ঠে বললে, তুমি হীরের চেয়েও দামী।

বুঝতে পারি, এইবার ক্লেদাক্ত মুহূর্তগুলো এগিয়ে আসবে। প্রতি রাত্রের মত আমাকে পান-পাত্র ভরে দিতে হবে। সুরার নেশায় মশগুল হয়ে ছাব্বিশ বছরের তরুণীর দেহ থেকে অমৃতের সন্ধান করবে শেয়ার মার্কেটের দালাল কুমার চৌধুরী। তার আগে নিজের মনটাকে কুলুপ এঁটে গোপন কুঠরিতে বন্দী করে রাখতে চায় মালা বিশ্বাস নামে মেয়েটি।

আজ সকাল থেকেই মনটা কেমন যেন ডানা মেলে দিয়েছিল।

একটু নিশ্চিন্তে বসে থাকতে হলে অন্যদিন মনে মনে হাঁপিয়ে উঠি। কারণ, চিন্তামুক্ত হতে পারি না। অবসরের মুহূর্তগুলো আমার কাছে সবচেয়ে বিলম্বিত।

অথচ আজ কত নিশ্চিন্তে মুহূর্ত যাপন করছি। চিন্তা-ভাবনা নেই, নেই দুঃস্বপ্নের অবকাশ—শুধু বসে থেকে সুন্দর স্বপ্নের মধ্যে সময় কাটানো।

স্বপ্ন দেখতে ভুলে গিয়েছিল মালা। যেন তার অধিকার ছিল না।

স্বপ্ন দেখার। সুন্দর-স্বপ্নের রাজ্যে সে তো অবাঞ্ছিতা।

কিন্তু আজ? আজ স্বপ্ন দেখছে সে। অনেক দিন পর মাধুকরী গ্রামের সেই মেয়েটা হঠাৎ কখন মালা বিশ্বাসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।

অন্যের তো লাগবেই, ভাবতে আমারই অবাক লাগে—নিজেকে মাঝে মাঝে ভাগ করে ফেলি। এক আমি আর-এক আমির কথা বলি। অথচ দুয়ে মিলেই তো আমি। নাম আমার একটাই। মালা বিশ্বাস।

আমি মনের মধ্যে আর-এক মালা বিশ্বাসকে দেখছি। যার স্থান ছিল একটি সুন্দর সংসার-বৃত্তের মধ্যে। মা-বাবা, ভাই-বোন কাকা-কাকিমা, তারপর আরো মানুষের মধ্যে সে-ও একজন। বংশের মধ্যে মেয়ে বলতে অনেকদিন সে একাই ছিল। পরে অবশ্য ছোটকাকার একটি মেয়ে হয়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে বয়সের ব্যবধান ষোল বছরের। সুতরাং ষোল বছর ধরে সে একাই সকলের স্নেহের উপস্বত্ব ভোগ করছে। স্নেহ, ভালোবাসা—একটি মেয়ে যা যা পেতে পারে সবই পেয়েছে।

কিন্তু ওকে কেউ শাসন করেনি। শাসন কি, মালা তা জানতো না। মেয়েটা শিশুকাল পেরিয়ে কৈশোরে পড়লো, কৈশোর থেকে যৌবনের মুখোমুখি হলো। দেহটা নানা ঐশ্বর্যে ভরে গেল, কিন্তু মনটা তখনো সেই পুরনো বিন্দুতে দাঁড়িয়ে। মনের দিক থেকে মালা কারো কাছে বড় হলো না। হতে চাইলো না। সে আগের মতই খেয়াল মাফিক চলতে চায়। চলেও।

হঠাৎ আমি হেসে উঠলাম।

ছোটকাকা সেদিন কোর্ট থেকে ফিরে একটা সুন্দর প্যাকেট আমার হাতে দিল। (আমার ছোটকাকা কোর্টে মোক্তারী করে।)

—কি আছে কাকু? কাকিমার শাড়ি? বলে প্যাকেটটা খুললাম। লাল রঙের পিওর সিল্কের শাড়ি, আর রঙ মিলিয়ে

ব্লাউজ। বললাম, তুমি কিছু জানো না কাকু। কাকিমা তো কালো। কালো বৌ কি লাল শাড়ি পরে?

ছোটকাকা আমার গালে দু আঙুলের টোকা দিয়ে বললে, না-গো-না ফর্সা মেয়ে, এ শাড়ি তোমার। বুঝেছ?

—আমার!

—হ্যাঁ ফর্সা মেয়ে, তোমার।

—আমি তো ফ্রক পরি।

ঠিক সেই মুহূর্তে কাকিমার কণ্ঠস্বর কানে এলো।—এই মালা, মুখপুড়ি শোন।

চলে গেলাম কাকিমার কাছে।

কাকিমা আমাকে কাছে ডাকলো। বসলাম কাকিমার পাশে। কাকিমা বললে, ওই ছাখ—দেখেছিস?

বসেছিলাম খাটের ওপরে। সামনে ড্রেসিং টেবিলে আমার আর কাকিমার প্রতিবিম্ব ভাসছে।

প্রতিবিম্বের দিকে চোখ রেখে হেসে উঠলাম। বললাম, ওই তো তুমি, ওই তো আমি।

—আমি তুমি না, বলে কাকিমা আমার চুলের মুঠি ধরে টানলো।

—তবে?

—আঃ, তুই কি সত্যিই বড় হবি না? কাকিমা আমার প্রতিবিম্বের দিকে চোখ রেখে বললে, ছাখ না—ভালো করে ছাখ।

—দেখছি তো।

—কী, দেখছিস?

—কেন, তুমি আর আমি।

(এবারে আচমকা আমার ফ্রকটা জোর করে টেনে বুকের কাছে নামিয়ে দিলে কাকিমা। বললে, দেখেছিস?)

সেই মুহূর্তে আমার পৃথিবীটা যেন কক্ষচ্যুত হলো। মালা নামে কিশোরীর যে মৃত্যু হয়েছে, সে খবর তো আমার জানা ছিল না।

অথচ আমারই মধ্যে তার মৃতদেহটাকে গোপন রেখেছি এতদিন। কিন্তু মৃতদেহ কি গোপন রাখা যায়?

কখন মরে গেল কিশোরী মালা!

কই, তার তো কোন অসুখ করেনি। সে তো সুস্থই ছিল। সে কি সত্যি মরেছে?

প্রথমে বিশ্বাস হলো না। কিন্তু আরশির কাঁচে আপন প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে এক সময় স্পষ্ট দেখলাম, কিশোরী মালা আর নেই। আমার যুবতী-কায়ার চৌহদ্দি জুড়ে তার ছায়াটা শুধু রয়েছে।

দু-চোখে জল গড়িয়ে পড়লো। জীবনে সেই আমার প্রথম কান্না। তবে খুব শিশু বয়সে হয়তো কেঁদেছি, যা আমার স্মৃতির বাইরে।

—কাঁদছিস কেন? কাকিমা আমাকে বুকের মধ্যে নিবিড় ভাবে টেনে নিয়ে আমার এলানো চুলগুলো নিয়ে নাড়া-চড়া আরম্ভ করলে।

সেই দিনই বন্ধ-ঘরে কাকিমা আমাকে শাড়ি পরালো। ব্লাউজটা ছোট হয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও বুকের ওপরকার বোতাম দিতে পারেনি। শেষটা কাকিমা বাক্স থেকে নিজের ব্লাউজ বার করে আমাকে পরিয়ে দিলে। বললে, ধাড়ী মেয়ে—এখনো কিনা ভাবিস ছোট্টটি আছিস। জানিস আমার ব্লাউজের সাইজ কত?

ভাগ্যিস ঘরে কাকিমা ছাড়া আর কেউ ছিল না। থাকলে সেদিনের সেই লজ্জার মুহূর্তে কি যে করতাম জানি না।

শাড়ি পরলাম। কাকিমা আমাকে জোর করে এবারে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বেতের মোড়াটায় বসালো। বললে, চুপ করে বোস। চুল-টুল বেঁধে একেবারে টিপটপ করে দিই।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি তখন ঘামছিলাম। শীতের দিনেও মনে হচ্ছিল পচা ভ্যাপসা গরমের মধ্যে রয়েছি। (তাছাড়া শাড়ি, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ারের বন্ধনে নিজেকে কেমন যেন অসহায় বোধ হচ্ছিল। ভাবছিলাম, কেন আমি বড় হলাম? কেন—কি জন্তে?)

অথচ মুখে তখন একটি কথাও বলতে পারছিলাম না। আর কাকেই বা বলবো? কাকিমাকে? বললে, এক্ষুনি তো আমাকে নিয়ে একচোট কথার ফুলঝুরি ওড়াবে। তার চেয়ে চুপ করে থাকা ভালো।

শাড়ি পরেছি আজ। কিন্তু কেমন করে বেরোব মানুষের সামনে। সবাই কি ভাববে। তার চেয়ে ঘরের কোণে বসে থাকি। এখানে তো ঘরের লোক ছাড়া বাইরের কেউ দেখতে আসবে না।

কাকিমার ঘরে বসে রইলাম।

আমাকে বসিয়ে রেখে কাকিমা উঠতে চাইলো। বললাম, কোথায় যাচ্ছো কাকিমা? বসো।

—আমার কি বসে থাকলে চলবে—তুই-ই বা বসে থাকবি কেন? নতুন শাড়ি পরলি, যা বড়দের সবাইকে প্রণাম করে আয়।

—না কাকিমা, আমি কোথাও যাবো না।

—তবে থাক কনে-বৌটির মত বসে।

কিন্তু কত সময় এমনি করে ঘরের কোণে একলা বসে থাকবো। সাজানো-গোছানো সেলুলয়েডের পুতুল-বৌটির মত আস্তে আস্তে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

বারান্দায় দাঁড়াতে পারলাম না। হোক না দোতলার বারান্দা—তবু নিচে পথের লোকের দৃষ্টি এখানে পৌঁছতে তো বাধা নেই। আমি বারান্দায় এসে দাঁড়াতে চেনা-অচেনা কয়েকটি চোখ এসে পড়লো আমার ওপর।

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। কাকিমা একটা হ্যারিকেন রেখে গেল আমার সামনে। ঘরটা আলোয় ভরে গেল।

আলো দিয়েই কাকিমা চলে গেল। দাঁড়ালো না। আমি তেমনি আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম কাকিমার খাটের কোণে।

এক-এক করে সবাই এলো আমাকে দেখতে। মা দাদা—সবাই। শেষটা এলো বাবা। এসেই বললে, তুই এত বড় হয়ে গেছিস মালা!

—বাবা!

বলে বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমার কণ্ঠস্বর, আমার কাছেই কতকটা আর্তনাদের মত শোনালো।

—কি রে অমন করছিস কেন!

—বাবা, তোমাদের কাছে আমি কোনদিন বড় হবো না। বড় হতে চাই না। আমি এমনি ছোট হয়েই থাকবো—বাবা—

আমি কথা শেষ করতে পারলাম না। বাবা ততক্ষণে বলতে আরম্ভ করেছে, মালা, মেয়ে তো বাবা-মার কাছে চিরদিনই মেয়ে থাকে, আমাদের কাছে তুই বড় হয়েও ছোট। কিন্তু একটা কথা কি জানিস, বয়েসটা তো দাঁড়িয়ে থাকে না। সে ঠিকই এগিয়ে যায়। তোর বয়েস তো হয়েছে—এবারে তোকে নিয়ে অন্য ভাবনা।

—বাবা, ওসব কথা এখন থাক। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, অন্য কথা বলো।

কিন্তু বাবাকে কথা বলার সুযোগ দিলাম না। তার আগেই আমি বলতে আরম্ভ করেছি—আজ বড় বাগানে চড়ুইপাখী ধরতে গিয়েছি, তারপর বোসদের পুকুরে সাঁতার দিয়েছি, কলঙ্কী ঝিলের ধারে গিয়েছি মণ্টু দাদার সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে, তারপর—

বাবার মুখটা হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। আমার পিঠের ওপর হাত দুটো ছিল, নেমে গেল আস্তে আস্তে। বলতে শুনলাম, কোন মণ্টু দাদা?

—জানো না! তোমার বন্ধু হাবুল দত্তর ছেলে।

শুনেই বাবার ভ্রূ কুঁচকে উঠলো।

বাবাকে কখনো ভয় পাইনি। আজই পেলাম। তাও এমন কিছু নয়, একটু ভয়-ভয় করলো এই পর্যন্ত।

—মণ্টু ছেলেটি বাঁদর। ওর সঙ্গে মিশো না।

—কেন বাবা, মণ্টুদা কি করেছে?

—বললাম তো, ওর সঙ্গে মেলামেশা কোরো না। ও একটি বাঁদর, লেখাপড়া শিখলো না, মানুষ হলো না। শুধু যাত্রা-থিয়েটার করে বেড়াবে—হাবুল পর্যন্ত ওকে দেখতে পারে না।

সেদিন ওই পর্যন্তই বললে বাবা। তারপর আমাকে নিয়ে এলো অন্য ঘরে। যে ঘরে এসে বাবার পুরনো মেজাজ ফিরে পেলাম। ছোটকাকাকে ডেকে বাবা বললে, তুই কি করেছিস অনিল ?

ছোটকাকা যেন একটু বিস্ময় নিয়েই বাবার দিকে তাকালো। আমার একটি হাত ধরে বাবা দাঁড়িয়ে। বললে, এ তুই কি করলি অনিল—মেয়েটার বয়েস এক শাড়ি পরিয়েই বাড়িয়ে দিলি।

ছোটকাকা হো হো করে হেসে উঠলো। সেই সঙ্গে বাবাও যোগ দিলে। বাবা-কাকার মিলিত কণ্ঠের হাসি শুনে সবাই ছুটে এলো। তারই মধ্যে কাকাকে বলতে শুনলাম, আর কি ধিঙ্গি মেয়ের ফ্রক পরা মানায় ?

—তা সত্যি, বাবা বললে, তা মালাকে কিন্তু বেশ মানিয়েছে।

—মানাবে না কেন ? কাকা ততক্ষণে বাবার হাত থেকে আমাকে কেড়ে নিয়েছে। বললে, এ মেয়ে কি সে মেয়ে, এ একেবারে সোনার পুতুল। নকল সোনা নয়, খাঁটি সোনা।

—সোনার পুতুল নয়, মোমের পুতুল, বাবা ঘরে ছিল বলেই কাকিমার কণ্ঠস্বর অনুচ্চ—ত্মাখো না, একটু আঁচ সহ্য হয় না।

মা বললে, তোমার আদরেই তো ও অমন হয়েছে কমলা। যেমন তুমি, তেমনি ঠাকুরপো।

আমি তখন ছোটকাকার বুকে মাথা রেখে মনটাকে অভিমানে ভরে তুলছি।

ঘরের মধ্যে হাসি-খুশির আবহাওয়া তৈরি হলো। রীতিমত মজলিশ বসে গেল আমাকে নিয়ে।

আমি আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম সে আসরের মধ্যমণি হয়ে।

পুরনো কথা যেন স্বপ্নের মত।

অথচ এইসব কথাই কত সত্যি ছিল আমার জীবনে। আর কথা কি দু-চারটি। কত কথা আছে। কত ঘটনা আছে। সে এক মুখর অধ্যায়।

সেই মুখর দিনগুলোকে স্মরণ করছিলাম। স্বপ্নের মত সে সবদিন। হয়তো মনে হবে আজকের পরিবেশে সেদিনের কথা স্মরণ করে কান্না পায় না কেন? সেদিনের কথা মনে করার পরেও এমন সহজ হয়ে থাকি কি করে?

চোখ আছে আমার, চোখে জল আসার পথও আছে। কিন্তু কান্না সহজে আসে না। তবুও মাঝে মাঝে চোখ দুটো জলে ভিজে উঠেছে বৈকি। হয়তো দু'চার ফোঁটা গণ্ড বেয়ে মাটিতে ঝরেও পড়েছে। তবে তা ব্যতিক্রমের মত। এই তো আজ। বেশ তো খাটের ওপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে পুরনো দিনের স্মৃতিতে হারিয়ে গিয়েছি। এই তো আমি পুরনো দিনের কথা মনে করতে বিচিত্র এক স্বপ্ন সুখ অনুভব করছি। কই, একবারও তো আমার মনটা ককিয়ে উঠছে না। একবারও তো মনে হচ্ছে না, হায় রে সেই স্বপ্ন দিয়ে গড়া জীবন, হায় রে সেই নানা-রঙের দিনগুলি! বরং বেশ সহজ ভাবে সেদিনের স্মৃতিকে রোমন্থন করে অদ্ভুত এক আনন্দ-স্বাদ উপভোগ করছি।

অনেক সময় একভাবে শুয়েছিলাম। এবার পাশ ফিরলাম। দৃষ্টিটা পড়লো বাইরের দিকে। পরিষ্কার রোদ উঠেছে। ঘড়িতেও বলছে বেলা সাড়ে আটটা। অর্থাৎ বেশ বেলা হয়েছে। অন্যদিন এ সময় আমার বাথরুম-পর্ব চুকে যায়। এতক্ষণে রামকৃষ্ণের পটে মালা দিয়ে, শুচিস্নিগ্ধ হয়ে বেতের মোড়াটা নিয়ে বসি সকালের সংবাদপত্র দেখতে।

আমার পৃথিবী এখানে চার দেয়ালে বন্দী হলেও বাইরের পৃথিবীকে জানবার আগ্রহের কমতি নেই। আজ খবরের কাগজটা পড়ে রয়েছে দেখেও পড়তে ইচ্ছে হলো না। থাক না একদিনের খবর অজানা হয়ে। তাতে আমার কিছু যাবে-আসবে না।

টেবিলের ওপর কুমারের মনিব্যাগটা পড়ে রয়েছে। ভুল করে ফেলে গেছে। বাড়ি ফিরে ট্যাক্সি-ভাড়া দিতে অসুবিধে হয়েছে

নিশ্চয়ই। অসুবিধে আর কি, বাড়িতে ঢুকে চাকর-দারোয়ানের হাত দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে হয়তো।

দিনের আলোয় বড় একটা এখানে থাকে না কুমার। কখনো মাঝ-রাতে, কখনো ভোর হবার আগে চলে যায়। আজও গেছে শেষ-রাতে।

ওই এক মানুষ কুমার চৌধুরী। রাতে মানুষটা কেমন যেন হিংস্র হয়ে ওঠে। আর দিনের বেলায় শান্ত গোবেচারা হয়ে যায়। দিনের বেলা ওকে দেখলে মনেই হবে না, ওই মানুষটা রাতে জৈবিক তাড়নায় হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

সন্ধ্যার পর কুমার যখন আসে, তখন এক মূর্তি, আর তারপর আর এক মূর্তি। কিন্তু শেষ-রাতে, অর্থাৎ ভোর চারটে না বাজতে যখন চলে যায়, তখন কে বলবে ও সেই মানুষ। মনে হয় যেন আর কেউ। যে কিছু জানে না। যার দেহে মনে এতটুকু মলিনতা নেই।

কুমার চৌধুরী চলে যায়। আমি দরজাটা বন্ধ করে দিই। সে সময়ে একবার আমার মুখের দিকেও তাকাতে পারে না। ও যেন তখন অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। যাবার সময় একবার মুখ ফুটে বলতেও পারে না, আমি যাচ্ছি মালা। কিংবা আর কোন কথা।

আজ কিন্তু যাবার সময় সে বলে গেছে, আমি সন্ধ্যের পরেই আসবো মালা। তুমি তৈরী থেকো। পৌনে ন'টায় পুরী এক্সপ্রেস ছাড়ে।

এখন বাথরুমে যাবো। শাওয়ারটা খুলে দিয়ে স্নান করবো অনেক সময় ধরে। যত সময় না মনে হয়, আমি নয়—আমার দেহটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

আজও বাথরুমে এলাম। তোয়ালে, সাবান, সবই ঠিক আছে। কিন্তু শ্যাম্পুর শিশিটা নেই। বাথরুম থেকে আবার ঘরে এলাম। কামিনীর ছেলেটাকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। হাড়-জিরজিরে চেহারার বারো-তেরো বছরের ছেলে।

—কি রে দাশু ?

—মা র অসুখ করেছে, কাজে আসতে পারবে না। তাই আমি এলাম।

কামিনী আমার ঘরের কাজ করে। একসময় সে-ও এ বাড়িতে আমাদেরই মত একজন ছিল। তারপর দুষ্ট ব্যাধি এসে যৌবনকে অকালে তার দেহ থেকে ছিনিয়ে নিলে। যা কিছু সঞ্চয় ছিল, সবই গেল। শেষটা আরম্ভ করলে ঝি-গিরি। পাশেই বস্তিতে থাকে ওই ছেলেটাকে নিয়ে। ছেলেটাও জন্মরুগ্ন।

—তুই যা দাশু, আমি নিজেই করে নেব'খন।

দাশু তবুও দাঁড়িয়ে রইল। বুঝতে পারি ও কেন দাঁড়িয়ে আছে। কিছু জানতে না চেয়ে পাঁচটি টাকা বার করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, মা কেমন থাকে বিকেলে খবর দিস। বুঝলি ? আর তোর মাকে বলিস, আজ রাতের গাড়িতে আমি পুরী যাচ্ছি।

টাকা পাঁচটি প্যান্টের পকেটে পুরে দাশু চলে গেল।

সকাল, দুপুর কাটলো পুরী যাবো এই চিন্তা নিয়ে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। গেলাম রীতার ঘরে। রীতার ঘরে তখন এলা বসে। আমাকে দেখেই এলা বলে উঠলো, কি ভাগ্যি—তুই যে ঘরের বাইরে ? জাত যাবে না তো ?

এলা কোন সময়েই আমাকে সহ্য করতে পারে না। শুধু এলা কেন, এ বাড়ির সবাই আমাকে কিছুটা এড়িয়ে চলতে চায়। আমি যেন ওদের চেয়ে কুলীন কেউ। ওদের সঙ্গে তাস খেলি না, ওদের খিস্তি-খেউড়ের আসরে বসি না, ওদের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করি না—এসব তো আছেই, এর ওপর রয়েছে কুমার চৌধুরীর মত পোষ-মানা বাবু। আমাকে নিত্য-নতুন বাবুর অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়াতে হয় না—এর জন্যেও হিংসে।

তবুও এর মধ্যে রীতা কিছুটা ব্যতিক্রম। অন্তত ওপর ওপর আমার সঙ্গে তার ভাবের অভাব নেই।

—রীতা তোর কাছে একটা দরকারে এসেছি।

—বল্ না।

ভেবেছিলাম এলার সামনে বলবো না, তবু বললাম। আজ রাতে পুরী যাচ্ছি ভাই। আমার টিয়ার খাঁচাটা তোকে দিয়ে যাবো, একটু দানাপানি দিস।

এলা ঢলে পড়লো রীতার গায়ে। কদর্যভঙ্গি করে বললে, এখানে হাবুডুবু খেয়ে হচ্ছে না—পুরীর সমুদ্রে যাচ্ছে হাবুডুবু খেতে। দেখিস, যেন মরিস নে দম আটকে।

—এই, চুপ কর না। এলার এ ধরনের ব্যবহার রীতার অপছন্দ। বললে, তুই বড্ড বাজে বকিস এলা।

—তা বৈকি। এলা এবারে সরাসরি আমাকে লক্ষ্য করে বললে, যাই বলিস মালা, আসলে আমরা 'বেশ্যা মাগী' ছাড়া আর কিছু নই।

ইচ্ছে হলো এলাকে দু কথা শুনিয়ে দিই। কিন্তু না, থাক। ও যা বলছে বলুক। তা ছাড়া একেবারে মিথ্যে তো বলে নি।

—তুই যা মালা, আমি খাঁচাটা নিয়ে আসবো'খন, রীতা বললে, আমি একটু বাদেই যাচ্ছি।

চলে আসছি। শুনতে পেলাম এলার কথা।—তোর পোষা বাবুটাকে দিয়ে যা না—দিবি ?

কথার শেষে এলা যেন হেসে গড়িয়ে পড়লো। সর্বাঙ্গ রি-রি করে জ্বলে উঠলো। তবু রাগ চেপে নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

দাশু এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে। জানালো, তার মায়ের জ্বর বেড়েছে। বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে সকাল থেকে।

দাশুর করুণ মুখের দিকে চেয়ে আমার মনটা ভিজে উঠলো। ভাবলাম, পুরী চলে যাচ্ছি, ক'দিন থাকবো না, হয়তো দিন চলবে না কামিনীর। পঞ্চাশটি টাকা বার করে দাশুর হাতে দিয়ে বললাম, সাবধানে নিয়ে যাবি, পঞ্চাশ টাকা আছে।

দাশু যাবার আগে আমাকে প্রণাম করে গেল।

হঠাৎ মনে পড়লো খোকনের কথা। আমারো ওই রকম একটি

ছোট ভাই ছিল। ক'বছরে সে হয়তো কত বড় হয়ে গেছে।

মুহূর্তে উন্মনা হলাম। ছোট ভাই খোকনের ছবিটা মনের মধ্যে আঁকতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম।

ডায়েরী লেখাটা আমার অভ্যেস। সারা দিনটাকে নানা কথার মারপ্যাঁচে ধরে রাখতে চেষ্টা করি। অনেক সময় সত্যি কথাও গোপন করি। এ যেন নিজের কাছ থেকে নিজেরই পালিয়ে থাকা। তবে অনর্থক মিথ্যে কথা লিখে নিজেকে ফাঁকি দিই না।

ডায়েরী রাখার অর্থ খুঁজে পাই না। তবু রাখি। এ যেন আর কিছু নয়—সময়ের কঙ্কালকে জমিয়ে রাখা। জাদুঘরে রাখা মমির মত।

কলকাতা থেকে রাতের গাড়িতে পুরী এলাম। আসার পথটুকু বেঁধে রাখছি ডায়েরীর পৃষ্ঠায়।

কুমার চৌধুরী এখানে তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে। বলে গেছে, ফিরতে চার-পাঁচ ঘণ্টা দেরী হবে। বন্ধুটি থাকে এখান থেকে বেশ কিছু দূরে। যেতে আসতেই অনেকটা সময় যায়।

ডায়েরী লেখার এই তো অবসর। লিখছিও। 'সাগর বিহঙ্গ' হোটেলের নির্দিষ্ট কক্ষে খাটের ওপর বুক আর চিবুকের নিচে বালিশ রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে লিখে চলেছি। এমনি করে শুয়ে থাকলে পা দুটি ভাঁজ করে ওপরের দিকে তুলে রাখি। কখনো আবার দুমড়ে নামিয়ে দিই।

একমনে লিখছি। আর মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে উত্তাল সমুদ্রকে দেখছি।

গত কাল রাতে হাওড়া স্টেশনে অপেক্ষমান পুরী এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠলাম।

প্রথম শ্রেণীতে আমরা ছাড়া আরো দুজন যাত্রী। তাঁদের দেখে মনে হল, স্বামী স্ত্রী। শুনলাম, কটকে নেমে যাবেন।

নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন ছাড়লো। প্রথমটা জানালার ধারে বসে থাকতে বেশ লাগছিল। খড়্গপুরে ট্রেন থামতে প্ল্যাটফর্মে নেমে এলাম।

প্ল্যাটফর্মে নেমে কামরার কাছাকাছি পায়চারি করছি। দেখছি, আশপাশের কামরা থেকে অনেকগুলো চোখ আমার ওপর এসে পড়েছে। ওরা জানে, আমি ওদের কাছে কখনো যাবো না—তবু এই মুহূর্তে আমাকে কাছে পাওয়ার প্রত্যাশা তাদের। পুরুষ জাতটার এক শ্রেণীর মধ্যে এই ধরনের কাঙালপনা রয়েছে। কেন জানি না—নারী ওদের কাছে অনেক সময় পার্থিব যে-কোন সম্পদের চেয়ে মূল্যবান হয়ে পড়তে পারে। হয়ও।

অনেকগুলো উৎসুক দৃষ্টির সামনে পায়চারি করতে নিজেই কেমন বিব্রত বোধ করলাম। উঠে এলাম কামরায়। দেখলাম, কুমার চৌধুরী ঘুমিয়ে পড়েছে।

আরো যে দুজন যাত্রী, তাঁরাও তখন ঘুমের কোলে আশ্রয় নিতে ব্যস্ত।

তবু আমি একা একা জেগে রইলাম জানলার ধারে বসে। চলন্ত ট্রেন থেকে দেখতে লাগলাম বাইরের অন্ধকারের রাজ্য।

এক-এক করে অনেকগুলি স্টেশন পেরিয়ে গেল। তার মধ্যে তন্দ্রাও এসেছিল। জানালার কাছে মাথা রেখে অল্প একটু সময়ের জন্যে ঘুম-ঘুম তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম।

তন্দ্রাঘোর কাটলো কটক স্টেশনে পৌঁছতে। কামরার দুজন যাত্রী নেমে গেলেন। আর নতুন করে কেউ উঠলো না।

কুমার চৌধুরী তখনো ঘুমোচ্ছে। ভাবলাম, ঘুমোক ও। যেন পুরী পৌঁছনোর আগে ওর ঘুম না ভাঙে।

মনে মনে যে আশঙ্কা করছিলাম, অবশেষে সেই মুহূর্তই এগিয়ে এলো। ঘুম ভাঙলো কুমার চৌধুরীর। ঘুম ভাঙা চোখে প্রথমেই দেখলো আমার দিকে। তারপর শূন্য কামরায় দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলে।

হঠাৎ তড়াক করে উঠে বসলো কুমার। আমাকে ধরতে গেল

দুহাত বাড়িয়ে। মুহূর্তে সরিয়ে নিলাম নিজেকে। আজ যাই বলুক, ঠিক করেছি—কিছুতেই ধরা দেব না। কিছুতেই আমার দেহের দরজা ওর জন্যে আজ খুলে দেব না। তাতে যদি ও রাগ করে আমার ওপর, তাতেও ক্ষতি নেই। যে-কোন মূল্যে আজ নিজেকে রক্ষা করবো।

—কি হলো মালা?

—কিছু না। লক্ষ্মী ছেলের মত শুয়ে থাকো তো।

—না।

—না কেন?

উত্তর দিলে না কুমার চৌধুরী। সুটকেস খুলে বার করলো হুইস্কির বোতল। নির্জলা হুইস্কি পান করলো খানিক। দেখতে দেখতে মানুষটার চোখ দুটি লাল হয়ে উঠলো। ওর মধ্যে উত্তেজনাও লক্ষ্য করলাম। বেশ বুঝতে পারি, এবারে ও শক্ত হাত দুটি বাড়িয়ে দেবে আমার দিকে। তারপর আমার কোমল দেহটাকে পিষ্ট করবে। আমাকে জর্জরিত করবে। পুড়িয়ে খাক করে দেবে ওর কামনার আগুনে। তারপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে আমারই কোলে মাথা রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে বলবে, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও মালা।

মানুষটা তখন কিন্তু আশ্চর্য ভাবে বদলে যাবে। কে বলবে, এই মানুষটাই একটু আগে আদিম পাশবিকতার নেশায় মেতে ছিল।

সত্যি, কুমার চৌধুরীর মধ্যে একটা মানুষের মন আছে। যে মানুষ এখনো মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু একথাও জানি, আর কিছুদিন বাদে ও মানুষটা মরে যাবে। তখন?

সেই আগামী দিনের ভয়ঙ্কর মানুষটার ছায়া আমি মাঝে মাঝে ওর মধ্যে দেখতে পাই। আর সেই জন্যেই তো চেষ্টা করি, মানুষটা ভয়ঙ্কর পশু হয়ে ওঠার আগে আমি যেন মুক্তি পেয়ে আর কোথাও

চলে যেতে পারি।

নেশায় উন্মত্ত কুমার চৌধুরী উঠে দাঁড়ালো। আমাকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু এবারেও পারলো না। সরে এলাম। দেখলাম, আমাকে ধরতে না পেরে টাল খেয়ে পড়লো কুমার। পরক্ষণে রক্তচক্ষু তুলে আমার দিকে তাকালো।

বুঝতে পারি, এবারে ও ক্ষেপে যাবে। এবারেও হিংস্র নেকড়ের মত আমাকে আক্রমণ করবে।

কিন্তু আজ আমি স্থির করেছি, কিছুতেই ওকে ধরা দেব না। তাতে যদি আজই দুজনের মধ্যে চরম বিচ্ছেদ ঘটে যায়, যাবে।

আবার উঠে দাঁড়ালো কুমার। টলতে টলতে এগিয়ে এসে ধরতে চাইলো আমাকে। কোনদিকে পথ না পেয়ে ছুটে বাথরুমের মধ্যে চলে গেলাম। দরজা বন্ধ করে দিলাম ভিতর থেকে।

কুমার তখন সজোরে করাঘাত করছে বাথরুমের দরজায়। করুক। দেহের দরজা আজ কিছুতেই উন্মুক্ত করবো না। ও সারারাত মাথা খুঁড়ুক বাথরুমের দরজায়।

রাত শেষ হলো।

একটি বিচিত্র রাত। আমি ছিলাম বাথরুমের ভিতর বন্দী, আর একটি পুরুষ মাথা খুঁড়ে মরেছে সেই বাথরুমের দরজায়।

হাসিও পেল এই কথাটা ভাবতে।

জানি দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা বদলে যায়। তাই বাইরে এলাম। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, শেষ-রাতের দিকে বাথরুমের দরজায় আর আঘাত করেনি কুমার।

বাইরে এলাম। দেখলাম, কুমার চৌধুরী ঘুমিয়ে পড়েছে বাথরুমের দরজার কাছে।

পা বাড়াতে পারলাম না। কুমারকে না ডিঙিয়ে বাইরে যাওয়া যাবে না। অথচ ডাকতেও সংকোচ। একটা ব্যর্থ রাতের ক্লান্তিতে ঘুমিয়েছে কুমার।

কুমারকে দেখলাম। দেখে কেমন যেন কষ্ট হলো। করুণা নয়। একটি হাতের ওপর মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে সে। ঘুমের মধ্যেও তার মুখের রেখাগুলো কত স্বচ্ছ, কত স্পষ্ট।

বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিক সময়। তারপর ট্রেনের গতি মন্থর হতে বাইরের দিকে ফিরে তাকালাম। ভোরের স্পষ্ট আভাস পুবের আকাশে। সূর্য উঠছে।

ট্রেন খুরদা রোড স্টেশনের প্লাটফর্মে ঢুকছে। এবারে কুমারকে ডাকলাম।

এক ডাকেই উঠলো কুমার। উঠেই বেঞ্চির ওপর বসে আলোর স্পর্শ নিল সর্বাঙ্গে। তারপর আমার মুখের দিকে কেমন যেন কাতর দৃষ্টিতে তাকালো।

—কুমার।

কথা বললে না সে। বাইরের দিকে তাকালো।

এবারে বসলাম কুমারের পাশে। একটু নিবিড় হয়ে। কুমারের একটি হাত ছিল জানলার ওপরে। তার হাতের ওপর আলতোভাবে হাত রাখলাম। ট্রেন তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্টেশনে দাঁড়িয়েছে।

—রাগ কোরো না কুমার। অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট করেই বললাম, জীবনে এত বেহিসেবী হয়ো না। তোমারই ভালো হবে।

কুমার এবারেও কোন কথা বললে না।

—রাগ করেছো কুমার?

—না। কুমার বললে ফ্লাস্কে চা আছে না? আমাকে একটু দাও।

—ফ্লাস্কের বাসি চা নাই-বা খেলে। তার চেয়ে—বলে চা-ওয়ালাকে ডাক দিলাম।

মাটির ভাঁড়ে দু পাত্র চা, দুজনে হাত পেতে নিলাম। চা পানের পর একটা সিগারেট ধরালো কুমার। তাকালো বাইরের দিকে। বললে, দেখেছো মালা, কি সুন্দর!

পুরীর সাগর-বিহঙ্গ হোটেলের বারান্দায় আমার পাশে দাঁড়িয়ে

কুমার আরো একবার বলেছিল, দেখেছো। কত সুন্দর।

হোটেলের নামটিও সুন্দর। সাগর-বিহঙ্গ। নামটার মধ্যে রোমান্টিক কবিতার মিষ্টি আমেজ মিশে রয়েছে।

স্বর্গদ্বারের কাছাকাছি সমুদ্রের ওপরেই হোটেল। অভিজাত এবং আধুনিক। প্রতিটি কক্ষ মার্জিতভাবে সাজানো-গোছানো। তারপর কক্ষ-সংলগ্ন বারান্দায় ডেকচেয়ার পাতা। টবের গাছগুলোয় ফুল থাক-না-থাক গাছের কচি পল্লবগুলোও সুন্দর।

বারান্দায় বসলে দিগন্ত-প্রসারী আকাশ আর সমুদ্রটা যেন হাতের মুঠোয় এসে যায়। একটা অনাস্বাদিত উপলব্ধি আসে মনের মধ্যে। সে উপলব্ধিটা কেমন, তা বলে বোঝাতে পারবো না। তবে এটুকু বলতে পারি, যে মুহূর্তে সমুদ্র আর আকাশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিই, সেই মুহূর্তে মনে হয় আমার সত্তার মধ্যেও ওই আকাশের শূন্যতা। সমুদ্রের গভীরতার মধ্যেও আমি দেখতে পাই একটা সীমাহীন অন্ধকার। সমুদ্রের অন্ধকার আর আকাশের শূন্যতার স্বাদ অনুভব করতে করতে আমি আর এক জগতে হারিয়ে যাই। যে জগতে মালা বিশ্বাসের পক্ষে প্রবেশ করাটা এক্তিয়ার-বহির্ভূত কাজ।

এমনি এক শূন্য মুহূর্তে কুমার চৌধুরী কাছে এলো। সময়টা দুপুরের পর। কুমার এতক্ষণ শান্ত-মহিষের মত ঘুমোচ্ছিল নরম বিছানার ওপর। ঘুম ভাঙতেই উঠে এসেছে আমার কাছে।

তার প্রথম কথা হলো, চলো মালা—বেড়িয়ে আসি।

—এর মধ্যে ?

—হ্যাঁ, চলো,—আজ সমুদ্রের বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে অনেক দূর চলে যাই। যেখানে কেউ থাকবে না, শুধু তুমি আর আমি।

—তারপর ?

কুমারের চোখ দুটো মুহূর্তে কেমন জলে উঠলো যেন। ওর মুখের মধ্যে কামাতুর নেকড়ের ছায়াটা দেখতে পেলাম।

—লজ্জা করে না তোমার? হঠাৎ কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। বেহিসেবী উত্তেজনায় অধীর হয়ে বলে উঠলাম, ছিঃ ছিঃ, এমন সমুদ্র, এমন আকাশ—এসব দেখেও কি মনটা একটু ছড়িয়ে দিতে পারো না?

আমার মুখ থেকে একথা শোনার পরেও কুমার চৌধুরী আশ্চর্য ভাবে শান্ত। বললে, সমুদ্র, আকাশ—যাই বলো না কেন, আমার কাছে তোমার চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই।

বললাম, কুমার এটা তোমার বাড়াবাড়ি।

কুমার একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। বললে, আমি বলছি তুমি তৈরি হয়ে নাও।

—এখন নয়, একটু পরে। পাঁচটা বাজুক অন্তত।

—যা বলছি শোন। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি বেরোতে চাই।

—বেশ তো, তুমি যাও না।

—তোমাকেও যেতে হবে।

এবারে মনে হলো কুমার চৌধুরী সত্যিই একজন পুরুষমানুষ। আর তার পৌরুষ যে উহ্য হয়ে যায়নি সে কথাটা প্রমাণ করতে চাইছে মালা বিশ্বাস নামে মেয়েটার কাছে।

শেষপর্যন্ত কুমার চৌধুরীর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। বেরোলাম সাগর-বিহঙ্গ থেকে। বেলা তখন চারটে। বেলাভূমিতে তখনো রোদ্দুর। সেই রোদের মধ্যে কিছু মেয়ে-পুরুষকে বেলাভূমিতে বেড়াতে দেখলাম। অধিকাংশ কাঁচা বয়সের ছেলে-মেয়ে।

কয়েকজনকে দেখলাম এই অবেলায় সমুদ্রের জলে মাতামাতি করছে। আর ঝিনুক কুড়োনোটা সকলের কাছেই আনন্দের।

সত্যি কথা বলতে কি, অনেক মানুষের ভিড়ে আমি কেমন যেন সংকোচ বোধ করি। বিশেষ করে কোন স্বামী-স্ত্রীর মুখোমুখি হলে। এরপর যদি কেউ কোন চিরাচরিত প্রশ্ন কিছু জানতে চায়, তখন তো রীতিমত কান্না পেয়ে যায়। এক-একবার মনে হয়েছে

সাদা সিঁথিটা রক্তিম করে রাখলে সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়, কিন্তু তা আর কিছুতেই পারি না। একবার যে চিহ্ন মুছে ফেলেছি, আবার তা ফিরিয়ে আনতে পারি না। তাছাড়া একটা মিথ্যের চিহ্ন এঁকেই বা কি হবে। তার চেয়ে অপরের চোখে সত্যিটা প্রকাশ রাখাই ভালো। অন্তত নিজের কাছে সহজ থাকা যায়।

হোটেল থেকে বেরিয়ে স্বর্গদ্বারের দিকে চলেছি।

এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালাম। কোন কারণ ছিল না, তবুও।

কুমার জিজ্ঞাসা করলে, দাঁড়ালে কেন ?

হঠাৎ-ই বলে বসলাম, একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে।

—এই তো হোটেল থেকে চা খেয়ে বেরোলে !

—তা হোক, চলো আর একটু চা খাই।

—বলিহারী দিই তোমার ইচ্ছাকে।

তবুও আমার ইচ্ছার সামিল হলো কুমার।

কাছেই একটি দোকান। কয়েকজন ভ্রমণকারী ভিড় করেছে দোকানে, তারই মধ্যে একপাশে ছুটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

অনেকগুলি চোখ আমার ওপর এসে পড়লো। জন তিনেক কাঁচা বয়সের ছোকরা বসেছিল একান্তে, তারা তো নির্লজ্জের মত আমাকে দৃষ্টি দিয়ে চাটতে লাগলো। মেয়ে কয়েকটি ছিল, কেন জানি না তারাও আমাকে লক্ষ্য করছে। আমার গায়ে তো আমার পরিচয়ের নোটিস আঁটা নেই, তবু দেখছে কেন !

নতুন চার-পাঁচটি যুবক হৈ-হৈ করতে করতে দোকানে এলো। এসেই আমার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। এসবে আজকাল বিব্রত বোধ করি না। আগে করতাম। কলকাতার ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে - যেখানে চলি না কেন, এমনি ধারা নানা মানুষের দৃষ্টির উত্তাপ সহ্য করতে হয়। আগে ভাবতাম, পুরুষেরা অমন কাঙাল নয়নে আমাকে দেখে কেন ? তারপর ক্রমে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। (আমার রূপ আছে, যৌবন আছে, আর তারই জন্যে পুরুষেরা অমন করে দেখে। পুরুষ জাতটা চিরদিনই যৌবন-কাঙাল।)

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় অনুচ্চকণ্ঠের সংলাপ শুনতে পেলাম, নিশ্চয়ই দাদা গার্লফ্রেণ্ড নিয়ে পুরী এসেছে মজা লুটতে। কথাটা, দাদা অর্থাৎ কুমার চৌধুরীর কানে যায়নি। গেলেও কিছু হতো না। কুমারকে তো জানি, এসব ক্ষেত্রে ওর প্রাণে উত্তাপ সঞ্চার হয় না। বরং এসব কথা শুনলে আরো শীতল হয়ে যায়। একটা জায়গায় ও হল সাচ্চা পুরুষ। সে জায়গাটা হলো শেয়ার মার্কেট। সেখানে ওর জুড়ি নেই।

দোকান থেকে বেরিয়ে সাগরবেলায় খানিক দাঁড়িয়ে রইলাম। কুমারের অনিচ্ছাসত্বেও।

বললাম, এসো, দুজনে মিলে ঝিনুক কুড়োই। দেখি, কে কত কুড়োতে পারে। বলে আমি বালির ওপর থেকে ঝিনুক কুড়োতে আরম্ভ করলাম।

— কি ছেলেখেলা করছো? কুমার আমার আঁচল ধরে টানলো।

—ছেলেখেলা! বলে হাসলাম। আমার হাসিটা কুমারের ভালো লাগলো না। মুখে কিছু না বললেও, ওর চোখ মুখ দেখে তা বুঝতে পারলাম।

আবার বললাম, তুমি আমাকে নিয়ে কি করছো? এটা ছেলেখেলা নয়? এরমধ্যে নেই তোমার ছোটবেলার সেই মেয়ে-পুতুল নিয়ে খেলার মোহ? ছোট মেয়েরা ছেলে-পুতুল নিয়ে খেলতে ভালোবাসে, ছেলেরা খুশি হয় মেয়ে পুতুল পেলে। তাই না? তুমি আর ছেলেমানুষটি নও, অথচ মেয়ে-পুতুল নিয়ে তোমার খেলার ইচ্ছেটা যায়নি।

ফর্সা মানুষ কুমার চৌধুরী। দেখলাম, ওর মুখটা রক্তবর্ণ হয়ে গেছে। অথচ কিছুই বলতে পারছে না। এই মুহূর্তে আমার করুণা হলো ওকে দেখে।

—কি মহাপুরুষ, কুড়ানো ঝিনুকগুলো বালির ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বললাম, কথা বলছো না কেন?

—মালা, তুমি অধিকারের সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছো। কুমার

একটু চড়া সুরে বললে, ভুলে যেও না আমার নাম কুমার চৌধুরী।

—জানি গো জানি। একটু বাঁকা সুরেই বললাম, তুমিই তো ট্রেনের বাথরুমের দরজায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে। তোমাকে আর চিনি না ?

—মালা!

চুপ করে রইলাম। একটু আগে ওকে মনে মনে করুণা করতে চেয়েছিলাম, এখন মনে হলো করুণা নয়, ওকে ঘৃণা করাই উচিত।

কুমারের মুখের ওপর আমার কথার প্রতিক্রিয়ার রেখাগুলো লক্ষ্য করি। তারপর কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ মিশিয়ে বলি, কি, নাম ধরে ডেকেই চুপ করে গেলে কেন। বলো, কি বলবে ? শেয়ার মার্কেটে গেলে তুমি তো ভয়ঙ্কর একজন মানুষ, আর আমার কাছে এলে অমন দেউলে হয়ে যাও কেন ? তুমি হতে পারো কুমার চৌধুরী, কিন্তু আমিও মালা বিশ্বাস। আর এরপর যদি বলি, কুমার চৌধুরী মানুষটা আমার কব্জায় ?

এবারে আবার মুখ খুললো কুমার। বললে, তোমার মতলব কি বলো তো। তুমি কি চাও আমার কাছে ?

—তোমার কাছে কি চাওয়া যায় তা-ও জানি, আর চেয়ে কি পাবো তাও অজানা নয়। তুমি আমাকে হাজার হাজার টাকা দিতে পারো, দিতে পারো জড়োয়া, দিতে পারো আরো অনেক কিছু। কিন্তু যদি বলি, আমি তোমার গৃহলক্ষ্মী হতে চাই—চাই লালপেড়ে শাড়ি, শাঁখা আলতা আর সিঁদুর—পারবে তা দিতে ?

কুমার চুপ করে থাকে।

বললাম, জানি সেটুকু তুমি দিতে পারো না। সে ক্ষমতা তোমার নেই।

এবারে কণ্ঠে কিছুটা উত্তাপ এনে কুমার বললে, মালা তুমি কি চাও আমাদের এই পুরীর দিনগুলো বিস্বাদ হয়ে যাক।

—বিস্বাদ হবে কেন, হঠাৎ আমিই যেন বদলে গেলাম। সুর নামিয়ে নিয়ে এলাম স্বাভাবিকের চেয়ে নিচু পর্দায়। বললাম,

চলো না—দুজনে মিলে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে যাই।

কিন্তু অনেক দূরে যাওয়া আর হলো না। স্বর্গদ্বারের কাছে কিছুটা নির্জনে বসে রইলাম দুজনে।

তারপর সন্ধ্যের পর বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম জনতার ভিড়ে। দেখলাম, সমুদ্রবেলায় অজস্র নর-নারী জীবনের রস-সম্ভোগ করছে।

কাছেই একজোড়া তরুণ-তরুণী, মনে হয় নব-দম্পতি, তারা একই সঙ্গে ঘাড় হেঁট করে ঝিনুক কুড়োচ্ছে। ছেলেটি যত ঝিনুক কুড়োচ্ছে সবই রাখছে মেয়েটির আঁচলে।

হঠাৎ একটা ঢেউ এসে মেয়েটির শাড়ির আঁচল ভিজিয়ে দিলে। ছেলেটি তার প্যান্ট আগে থেকেই হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে রেখেছিল।

ছেলেটি জড়িয়ে ধরলো মেয়েটিকে। মেয়েটি তখন ভিজে আঁচলের দিকে তাকিয়ে বললে, কি হলো বলো তো।

ছেলেটি বললে, বেশ তো, সমুদ্রের ঢেউ এসে ভিজিয়ে দিলে আমার প্রেয়সীর শাড়ির আঁচল।

আমি যে ওদের কথা শুনছি, মেয়েটি বুঝতে পেরেছে। বললে, এই—চুপ করো না।

ছেলেটি আর মেয়েটি পাশাপাশি বসে বালির ওপর আঁক কাটতে লাগলো। একসময় মেয়েটি শুয়ে পড়লো ছেলেটির কোলে মাথা রেখে।

—এই শোনো। মেয়েটির কথা কানে এলো।—একটা কথা মনে এলো, বলবো ?

—কি ? ছেলেটি জানতে চাইলো।

—হাসবে না তো ?

—না।

মেয়েটি তার দুটি হাত তুলে দিল ছেলেটির চিবুকের কাছে। বললে, যদি ছেলে হয় নাম রাখব সাগর, আর মেয়ে হলে সাগরিকা।

—সাগরিকা নামটাই সুন্দর। ছেলেটি বললে।

—না, সাগর নামটি। মেয়েটি আরো নিবিড় হলো ছেলেটির কোলের মধ্যে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আমারই উদ্দেশ্যে আমারই দীর্ঘশ্বাস। মনে ভাবলাম, মালা বিশ্বাস মেয়েটা কি হতে পারতো, আর কি হয়েছে। আমি তো চাইনি এমন হতে। আমি অফুরন্ত প্রাণের সমারোহে বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাঁচতে দিলে না কামনা-সর্বস্ব পুরুষ। আমার বিশ্বাসের মূল্য দিতে পাবেনি সে। হয়তো সে পুরুষ ছিল না, ছিল কাপুরুষ। সে আমাকে ঠকিয়েছে।

হঠাৎ মনটা বিষিয়ে উঠলো। আমিও কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে নেব আমার পাওনা। তারপর আবার একদিন জীবনে ফিরে যাবো।

সে কাপুরুষটির নাম যদিও মনে এলো, তবু ঘৃণায় মনে মনেও উচ্চারণ করতে চাইলাম না।

তবু বলছি, তার নাম ছিল দীপক সান্যাল। আমারই সঙ্গে কলকাতায় কলেজে পড়তো সে।

রাতে সাগর-বিহঙ্গে ফিরেছি। কুমারকে নিজের হাতে সুরার পাত্র পূর্ণ করে দিয়েছি। আর ভেবেছি, মানুষটা নেশায় বেহুঁশ হয়ে যাক। আজ যেন ও না জাগতে পারে।

সত্যি তাই হলো। দেখলাম, এক সময় মাতাল মানুষটা খাটের ওপর লুটিয়ে পড়ে পাগলের মত বকতে আরম্ভ করলো। খানিক বাদে চুপ করে গেল। উপুড় হয়ে পড়ে রইলো খাটের ওপর।

নিঃশব্দে বাইরে এলাম। বারান্দায়।

ছোট একফালি বারান্দা। পাশাপাশি দুটি ডেকচেয়ার পাতা। তারই একটিতে বসে পড়লাম।

দৃষ্টির সামনে দিগন্ত-প্রসারী পরিবেশ। আকাশ আর সমুদ্র এক হয়ে গেছে। নীল আকাশ, নীল সমুদ্র—রাতে রঙ হারিয়ে অন্য রঙ পেয়েছে।

চুপচাপ বসে আছি মনের মধ্যে নানা চিন্তা নিয়ে। নানা

চিন্তার মধ্যে আমার মুক্তির চিন্তাটাই বড়। নিজের কাছ থেকে নিজে মুক্তি চাই। এক মালা বিশ্বাস আর-এক মালা বিশ্বাসের কাছ থেকে মুক্তি চায়।

আর এই মুহূর্তে কেমন যেন যন্ত্রণার উপলব্ধি আমার মনে। উঠে দাঁড়ালাম। বারান্দার রেলিংয়ের কাছে এগিয়ে গেলাম।

একটু ঝুঁকে দাঁড়াতেই মনে হলো, যদি বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিই। নিজের চিন্তায় নিজেই হাসলাম। কি আর হবে তাতে। মালা বিশ্বাস নামে একটা মেয়ে মরে যাবে। দেহটা মর্গে কাটা-ছেঁড়া করে ডাক্তারী রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিস জানাবে, এ ঘটনা নিছক আত্মহত্যার ঘটনা। কেউ বলবে না মালা বিশ্বাস মুক্তি চেয়ে আত্মহত্যা করেছিল।

দৃষ্টি গেল হোটেলের নীচে রাজপথের ওপর। যেখানে ল্যাম্প-পোস্টের নীচে আলোর উজ্জ্বল বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একজন যুবক। স্পষ্ট হলেও অস্পষ্ট। তবু মনে হলো, আমার চেনা জানা কেউ। কিন্তু কই, মনে করতে পারছি না তো।

সমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। বিরাট বিরাট ঢেউ ছুটে আসছে। মনে হয়, এই মুহূর্তে যেন সবকিছু ভেঙে দিয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই ভাঙলো না। সব যেমন ছিল, তেমনি আছে। কিছুতেই মনে করতে পারলাম না যুবকটি কে।

দেখলাম, এক সময় নিঃসঙ্গ যুবকটি পথ চলতে আরম্ভ করলো। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করলো তাকে। কিছুক্ষণ পরেই সে হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

আমার মনের সমুদ্রে তখন তুফান উঠেছে। তার মধ্যে মালা বিশ্বাস একটি হারিয়ে যাওয়া নামকে স্মৃতির আগল খুলে খুঁজে বার করতে চাইছে।

মনে এলো একটি নাম। অতনু। অতনু পাকড়াশী।

একটা ছবি ভেসে উঠলো।-আমার জীবনের অতীত দিনের ছবি।

কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হলো একটা দুরন্ত দানব যেন আমার

দিকে এগিয়ে আসছে। কুমার চৌধুরীর দুটি হাত পিছন থেকে আমাকে সজোরে আকর্ষণ করছে।

– কাকে দেখছিলে? কুমারের কণ্ঠস্বর জড়িত।—ল্যাম্প-পোস্টের নীচে যে দাঁড়িয়েছিল, কে সে?

—আঃ, ছাড়ো বলছি। কুমারের হাত থেকে নিজেকে জোর করে মুক্ত করতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। দানবটা আমাকে জোর করে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে জাপ্টে ধরেছে।

—আগে বলো ও কে?

—বলবো না।

—বলবে না? কুমার আমাকে নিয়ে খাটের ওপর লুটিয়ে পড়লো। তারপর আমার দেহটাকে নির্মমভাবে পিষ্ট করতে লাগলো। বললাম, আমাকে ছাড়ো বলছি, নয়তো চীৎকার করে লোক জড় করবো। বলবো, তুমি আমাকে ফুসলে নিয়ে এসেছো, আমি কুমারী—

—কুমারী! দাঁতে দাঁত চেপে কুমার বললে, বেশ্যার আবার সতী হবার সাধ!)

আচমকা চীৎকার করে উঠলাম। সে চীৎকার চার দেয়ালের বাইরে পৌঁছলো কিনা জানি না। কিন্তু আর চীৎকার করার অবসর পেলাম না। কুমার শাড়ির আঁচল দিয়ে চেপে ধরেছে আমার মুখ।

মুখের চাপা সরিয়ে নিতে শুরু করলাম অভিনয়। যে অভিনয়ে কুমারকে প্রথম রাতে কব্জা করেছিলাম, ঠিক সেই সুরে কথা বলতে লাগলাম। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। কোনদিকে কান নেই তার। আমার দেহটাকে তখন ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে যেন।

আর আমি! আমি তখন সব ভাবনা-চিন্তার বাইরে।

একসময় ভয়ঙ্কর দানবটা স্থির হয়ে গেল। খাটের একান্তে

লুটিয়ে পড়ে রইল আধো অচেতন হয়ে। একটু পরেই নাক ডাকতে আরম্ভ হলো। সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ালাম। শাড়ি, ব্লাউজ ছিঁড়ে কুটিকুটি করেছে। নখের আঁচড়ে রক্তের দাগ ফুটে বেরিয়েছে জায়গায় জায়গায়। আমার চিবুকেও রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে।

আরশির সামনে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম। এমন করে কখনো কাঁদিনি আমি।

নজর পড়লো হুইস্কির বোতলটার দিকে। অপরের পান-পাত্র পূর্ণ করে দিয়েছি, কিন্তু নিজে কখনো পান করিনি।

রীতার কথা মনে পড়লো। ও বলে, ওর মত জিনিস নেই। এক গ্লাস পেটে পড়লেই দুনিয়া সাফ। শুধু রীতা কেন, সবাই ওই একই কথা বলে। ঝি-গিরি করে কামিনী, সে-ও এক-আধদিন মদ নিয়ে খায়।

এগিয়ে গেলাম টেবিলের দিকে। হুইস্কির বোতলটা হাতে তুলে নিলাম। ঢক ঢক করে পান করলাম খানিকটা। গলা, বুক জ্বলে উঠলো— তবুও।

কয়েকটি মুহূর্ত কাটলো। এই মুহূর্ত ক'টির কথা জানি, আমার সামনে পৃথিবীটা যেন পাক খেতে খেতে মহাশূন্যে ছুটে যেতে লাগলো। চারদিকে কখনো আলো, কখনো অন্ধকার। সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে গেল। যে কুমারকে একটু আগে দানব আর নেকড়ের মত মনে হয়েছে, এবারে আমিই সেই দানবটির গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

কাল-রাত্রি ভোর হলো।

ঘুম ভাঙলো কুমার চৌধুরীর ডাকে। উঠে বসতে গেলাম। পারলাম না। মাথাটা তখনো টলছে। তাছাড়া সর্বাঙ্গে ব্যথার টাটানি।

প্রায় নগ্ন অবস্থায় পড়েছিলাম। কোনমতে ছেঁড়া শাড়িটা অঙ্গে জড়িয়ে নিলাম। শুনতে পেলাম কুমারের গলা। বলছে, আমি

টিকিটের জন্যে স্টেশনে যাচ্ছি মালা। আজই রাতের গাড়িতে কলকাতায় ফিরবো।

—যাও, আমি এখন ঘুমবো।

—তুমিও যাবে তো?

—না।

—যাবে না কলকাতায়?

—না, নরকে যাবো। বিকারগ্রস্তের মত উঠে বসলাম, আমায় একটু হুইস্কি দাও না কুমার।

কুমারের কাছ থেকে সাড়া মিললো না। পাশ ফিরে দেখলাম, ও বাইরে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। যাক। ও যেখানে খুশি যাক। আমি কিছুই বলবো না।

চোখের সামনে দিয়ে কুমার চলে গেল।

আমিও একটু বাদে উঠে পড়লাম। কিন্তু দাঁড়াতেও অস্বস্তি। তবু দেয়াল ধরে গেলাম দরজার কাছে। দরজাটা খুলতে গেলাম। বাইরে থেকে বন্ধ। নিশ্চয়ই শিকল টেনে দিয়ে গেছে কুমার।

একবার মনে হলো চীৎকার আরম্ভ করে দিই। ছুটে আসুক লোকজন। আমার অবস্থা দেখুক। কিন্তু না। থাক। তার আগে আমার অবস্থাটা আমিই দেখি।

আরশির সামনে দাঁড়ালাম। চিবুকে দাঁতের দাগ। দু'জায়গায় রক্ত ফুটে বেরিয়েছে। একটু ফুলেছেও যেন। বুকে পিঠে নখের আঁচড়। সেখানেও রক্ত শুকিয়ে আছে।

এ অবস্থায় বাইরে যাবো কি করে? লোকে দেখে কি বলবে? অন্তত দুটো দিন না হয় থাকি। কুমার চলে যাবে—যাক গে। ওর সঙ্গে প্রয়োজন আমার ফুরিয়ে গেছে।

সংলগ্ন বাথরুমে গেলাম। স্নান করে দেহের গ্লানি ধুয়ে মুছে ফেলতে চাইলাম। কিন্তু এ গ্লানি মুছে ফেলার নয়।

রাতের সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারের মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়ছে। এখনো আমার অঙ্গ জুড়ে গত রাতের স্মারক-চিহ্ন।

কি হবে আর এ-সবে। এভাবে বেঁচে থাকার অর্থ কী।

জানি তবুও আমাকে বাঁচতে হবে। আমার ভুলের মাশুল আমাকেই দিতে হবে।

হঠাৎ প্রশ্ন এলো মনের মধ্যে, জীবনে প্রথম ভুল কবে করেছি? পরমুহূর্তে মনে পড়লো আমার ছোটবেলাকার কথা। যখন আমার জীবনে এসেছিল মণ্টু।

মাধুকরী গ্রামের হাবুল দত্তের ছেলে মণ্টু। আমার চেয়ে বছর চারেকের বড়। ছোটবেলায় সে ছিল আমার খেলার সাথী। কৈশোরে যার কাছে শিখেছিলাম দামালপনা, যার সঙ্গে কলঙ্কী ঝিলে জলপদ্ম তুলতে জলে ঝাঁপ দিতাম। সাঁতার কেটে যেতাম অনেক দূর পর্যন্ত। তারপর কতদিন মণ্টুর সঙ্গে সাইকেলের পিছনে চেপে অনেক দূর পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছি। সেই মণ্টু দাদার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ হলো একদিন। নিষেধের বেড়া টেনে দিলে বাবা। এরপর এক-আধদিন দেখা হয়েছে, দু' এক কথায় সম্পর্ক বজায় রেখে আবার তফাতে সরে এসেছি।

এরপর আর দেখা হবার তেমন অবকাশ ছিল না। ষোল বছরে পাস করলাম হায়ার সেকেণ্ডারী। ছোটকাকার ইচ্ছে ছিল না, বাবার ইচ্ছাতেই কলকাতার কলেজে ভর্তি হলাম। থাকতাম প্রথমে মামার বাড়ি। পরে অসুবিধে হচ্ছে পড়াশুনার—এই অছিলায় মেয়েদের হোস্টেলে।

কফি হাউসে পরিচয় হয়েছিল দীপক সান্যালের সঙ্গে। পরিচয়ের মূলে ছিল মিনতি হাজরা। কিন্তু দীপক সম্পর্কে প্রথম দিনেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল রেবা সোম। বলেছিল, মিনতি ওকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই দীপকের সঙ্গে তোকে ঝুলিয়ে দিয়ে নিজে নিস্কৃতি পেতে চায়। তুই হিসেব করে চলিস।

বলেছিলাম দৃঢ়তার সঙ্গে, আমি মাতঙ্গিনী হাজরার দেশের মেয়ে, আমাদের দেহ-মন অন্য ধাতুতে গড়া।

রেবা হেসে বলেছিল, তবু বলছি—বন্ধু সাবধান।

দীপক আমার জীবনে আসার আগে আরো একজনকে বন্ধুর আসনে বসিয়েছিলাম। অতনু পাকড়াশী তার নাম। সে ছিল সূর্যের মত উজ্জ্বল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃস্থ। থাকতো একটা বস্তি-বাড়িতে। টিউশনির আয়ে কলেজে পড়তো। ভাল কবিতা লিখতে পারতো অতনু। জানি না এখন সে কি করে। তবে দীপকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সময়েই একবার রেবার মুখে শুনেছিলাম, অতনুর একটি কবিতার বই ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। এবং বিদগ্ধজনের স্বীকৃতিও পেয়েছে। কিন্তু অতনুর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। সে তখন সংসারের চাপে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে মফস্বলে চলে গেছে প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী নিয়ে।

দীপক আমার জীবনে রামধনুর সাত রঙ নিয়ে এসেছিল। তাকে ধ্রুবতারার মত সত্যি ভাবতাম। রেবা সোম যখন আমাকে সতর্ক করে দিয়ে কিছু বলতো, তখন মনে হতো ঈর্ষা নিয়েই সে একথা বলছে। যার জন্যে রেবা সোমের সঙ্গে কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ করলাম।

আর মিনতি হাজরা—সে তো তখনো আমাকে রীতিমত উত্তপ্ত করে। দীপকের ব্যাপারে তার প্রশস্তির যেন শেষ নেই। অথচ দেখতাম, বাস্তবক্ষেত্রে দীপকের সঙ্গে একটু ব্যবধান বজায় রেখে চলে। ব্যাপারটা বুঝতাম না।

তখন ভাবতাম, যাক গে অত বোঝার দরকার কি। আমার প্রয়োজন দীপককে। মিনতিকে নয়।

দীপককে জীবনের নায়ক ভেবে আমি তখন গর্বিত। অমন স্মার্ট ছেলে কলেজে আর দ্বিতীয় ছিল না। কি বিতর্কে, কি চলতি রাজনীতির আলোচনায়—ও সব সময় সামনে থাকতো।

যেখানে দীপক, সেখানে আমি। দুয়ে মিলে যেন এক অভিন্ন সত্তা। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী মহলে আমরা রীতিমত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের দুজনের নাম নিয়ে কলেজের দেয়ালে ব্ল্যাকবোর্ডে পেনসিল কিংবা খড়ি দিয়ে দু'চার কথা লেখাও আরম্ভ হলো। একজন নাম-না-জানা রসিক কিংবা

রসিকা তো দু-লাইনের কবিতা লিখে দেয়ালে লটকে রেখেছিল।

দীপক মালার প্রেম নিকষিত হেম,

চণ্ডীদাস লজ্জা পায়, রামী বলে সেম।

দেয়ালের এই দুটি লাইন ছাত্র ছাত্রীদের মুখে মুখে ফিরতো এক-একবার মনে হতো বিদ্রোহ করি, চলতি প্রেমের রাজ্যে বিপ্লব ঘটিয়ে দিই—অজস্র ছাত্র-ছাত্রীর সামনে চুম্বন দিই দীপককে। কিংবা দীপক সবার সামনে আমার খোঁপায় ফুল গুঁজে দিক, আর না হয় অনামিকায় আংটি পরিয়ে বলুক, এই দেখো আমাদের প্রেম।

কলেজে যখন এই অবস্থা চলছে তখন দীপকই একদিন আমাকে বললে, চলো ডায়মণ্ডহারবার ঘুরে আসি।

প্রস্তাবটা সময়োচিত। আমি তো আনন্দে ফেটে পড়লাম; আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, ডায়মণ্ডহারবার নয়—বকখালি।

দীপক বললে, সে তো আরো ভালো। কিন্তু তুমি হোস্টেল থেকে কি বলে বেরোবে?

উত্তরের জন্যে চিন্তা করতে হলো না। বললাম, বলবো একদিনের জন্যে বাড়ি যাচ্ছি।

দীপক আর আমি বকখালি যাবো, জানি না কথাটা কেমন করে জানাজানি হয়ে গেল।

রেবা সোমের সঙ্গে আমি কথা বন্ধ করেছিলাম। তবু রেবাই আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, সত্যি কি তোরা বকখালি যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

—কাজটা কিন্তু ভালো করছিস না।

—কেন তুই কি যেতে চাস? যা না—আমি না হয় নাই যাবো। আমার এ কথার মধ্যে কুৎসিত ইঙ্গিত ছিল। তা সত্ত্বেও রেবা এতটুকু উত্তেজিত হলো না। বরং শান্ত ভাবেই বললে, বকখালি আমি একাই যেতে পারি মালা, তার জন্যে দীপকের মত সঙ্গীর প্রয়োজন হয় না। আমাকে তুই অপমান করতে চেয়েছিস

—ক্ষতি নেই, তবু তোকে বলছি, এমন করে আগুন নিয়ে খেলা খেলিস নে।

—তোর কথা শেষ হয়েছে ?

—হ্যাঁ।

বলে রেবা চলে গিয়েছিল। আর আমি সেই মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে দীপকের কাছে এসে বলেছিলাম, জানো দীপক, রেবা আমাকে শুভেচ্ছা জানালো।

দীপককে সেই মুহূর্তে একটু স্থির মনে হয়েছিল। কলেজের তিনতলার বারান্দার কোণে দাঁড়িয়েছিল দীপক, আমার কথা শোনার পরেও কোন মন্তব্য করলো না। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, টুরিস্ট লজের খাতায় তুমি আমার বোন বলে নাম লেখাতে পারবে তো মালা ?

—মানে ?

—এ কথার মানে আবার বলে বোঝাতে হবে ? বলে আমার কানে-কানে দীপক এমন একটি কথা বললে, যে কথাটা শুনে আমি সেই মুহূর্তে হেসে উঠেছিলাম।

কলকাতা থেকে বকখালি।

পথ বেশী দূরের না হলেও ধকল আছে। বকখালিতে যখন পৌঁছলাম বেলা তখন তিনটে।

শূন্য টুরিস্ট লজ। জায়গা পেতে অসুবিধে হলো না। খাতায় নাম লিখলাম দীপক সান্যালের সহোদরা মালা সান্যাল। কিন্তু টুরিস্ট লজের ভারপ্রাপ্ত ভদ্রলোকের চোখ দেখেই বুঝেছিলাম, তাঁকে ফাঁকি দিতে পারি নি। তবুও ভদ্রলোককে ধন্যবাদ, তিনি এ নিয়ে কোন কথা বলেন নি। বরং আমাদের বয়সের কথা ভেবে তিনি 'তুমি' সম্বোধন করেই বলেছিলেন, যাও—সমুদ্র দেখে এসো।

আমরা সমুদ্রবেলায় গেলাম। জীবনে এই প্রথম সমুদ্র-দর্শন। সে এক বিস্ময়ের সমুদ্র। আমি যে কি করবো ভেবে পেলাম না।

শেষটা দীপকের হাত চেপে ধরলাম সজোরে। বললাম, দীপক আজ এখানেই থাকবো, এই বালির ওপর।

দীপক কিন্তু কোন কথা বললে না। শুধু একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে আমার চোখের ওপর।

মাথা রাখলাম দীপকের বুকে। দীপক আমার মাথার চুলে আঙুল চালাতে আরম্ভ করলো। আমার অঙ্গে-অঙ্গে বিদ্যুতের শিহরণ অনুভব করলাম।

—চলো, ওদিকটা যাই। দীপক বললে, এখানে নয়।

নির্জন সৈকতে কুমারী মালা বিশ্বাসের মৃত্যু হলো। মৃত্যু যে এত সুন্দর তা আগে জানতাম না।

বাইরে থেকে দরজার শিকল খোলার আওয়াজ পেলাম। কুমার ফিরে এসেছে।

আমারও স্নান সারা হয়ে গেছে। বেরিয়ে এলাম ভিজে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে। দেখলাম, কুমার এসে বসে আছে বারান্দায়। সমুদ্র দেখছে।

আমি ঘরে এসেছি, এটাও বুঝতে পেরেছে নিশ্চয়ই। পাউডারের কৌটো নাড়ছি, চেয়ারটা টেনে সরিয়ে রাখলাম—এর শব্দ ওর কানে গেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফিরে তাকালো না।

শেষটা আমিই ডাকলাম, কুমার, একবার এদিকে আসবে ?

যন্ত্রের মত আস্তে আস্তে উঠে এলো কুমার। দাঁড়ালো আমার সামনে।

বললাম, কিছু বলবো না—শুধু দেখে যাও, তুমি কেমন চিহ্ন এঁকে দিয়েছো আমার সর্বাঙ্গে।

(প্রথমে চিবুক দেখালাম, তারপর বুক। বললাম, আরো আছে, নাই-বা দেখলে।)

কুমারের মধ্যে আশ্চর্য এক নির্লিপ্ত ভাব দেখলাম। সে শুধু

বললে, আমি আজই চলে যাচ্ছি মালা। তোমার যে ক'দিন খুশি থাকো। তোমার যাতে কোন অসুবিধে না হয় সে ব্যবস্থা করে যাবো।

—তোমার সহৃদয়তার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ। একটু নাটকীয় ভঙ্গিতেই বললাম, আর কৃতজ্ঞতাও জানাচ্ছি।

কুমার আবার বারান্দায় গিয়ে বসলো। দৃষ্টি তার সমুদ্রের দিকে। শেয়ার মার্কেটের দালাল কুমার চৌধুরীর মধ্যে আজকের মতন এমন ভাবালুতা এর আগে একবার দেখেছি, যেদিন ও প্রথম এসেছিল আমার ঘরে।

এই মুহূর্তে কুমার চৌধুরীকে দেখে মনে মনে একটু বিস্মিত হলাম বৈকি। হঠাৎ ও আমার সম্পর্কে এমন নির্লিপ্ত আর উদাসীন হয়ে পড়লো কেন?

আমিও নিজেকে কুমারের চিন্তা থেকে সরিয়ে আনতে চাইলাম। স্নানের পর ভিজে চুল শুকোতে বারান্দায় এসে দাঁড়াবো মনে করেও, পারলাম না। ওখানে কুমার আছে। তাই জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। রোদ না লাগুক, উত্তাপটুকু তো পাবো।

বাইরে থেকে কলিংবেলটা কে যেন বাজালো। আমি তবুও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

কুমার উঠে এলো। দরজা খুললো। হোটেলের বয় ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসেছে। পিছনে কুমার দাঁড়িয়ে আছে।

পাছে বয়ের নজরে পড়ে চিবুকের ক্ষতচিহ্ন, তাই শাড়ির আঁচল চাপা দিলাম।

বয় চলে গেল। আমি তখনো দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম, কুমার পট থেকে শুধু চায়ের কাপ ভরে নিলে। আর কিছু নিলে না। অভ্যেস মতো এগিয়ে গেলাম। খাবারের পাত্র এগিয়ে দিলাম কুমারের দিকে। বললাম, খালি পেটে চা খেয়ো না।

কুমার বললে, একদিনের অনিয়মে কিছু হবে না। তুমি বরং খেয়ে নাও।

—তুমি না খেলে আমি কি খেতে পারি?

—কেন পারবে না। কুমার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললে, আর যদি না খাও, নিজেই কষ্ট পাবে।

আমিও শুধু চা পান করছি দেখে কুমার বললে, বয় যখন আসবে কি ভাববে জানো? ভাববে, একটা কিছু হয়েছে। আর হয়তো সেই কথাটাই কানাকানি হয়ে হোটেলে ছড়িয়ে পড়বে। তুমি যখন যাচ্ছো না—তখন ব্রেকফাস্টটা নিলেই ভালো করতে।

তবুও একটু টোস্টের টুকরো মুখে দিতে প্রবৃত্তি হলো না। কুমারও আর কিছু বললে না।

একটা দারুণ অস্বস্তির মধ্যে দুপুর কাটলো। বিকেলের দিকে কুমার তার ছোট স্যুটকেসটি গুছিয়ে নিলে। যাবার জন্যে তৈরী হয়ে আমাকে বললে, যাচ্ছি মালা। ড্রয়ারে একটা খামে হাজার টাকা রেখে দিয়েছি। আশা করি ওতেই তোমার হয়ে যাবে।

—ওটা তুমি নিয়ে যাও।

—প্রয়োজন না লাগে তো গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিও। আর শোনো, এই হয়তো তোমার সঙ্গে শেষ দেখা। এরপর যদি কোনদিন কোথাও দেখা হয়ে যায়, তা হলে বুঝবে সেটা নিছক দুর্ঘটনার সামিল। আচ্ছা চলি।

—এর মধ্যে যাচ্ছো? ট্রেনের তো দেরী আছে।

—আমার বন্ধুর বাড়িতে যাবো। তারপর সেখান থেকে স্টেশনে। বলে স্যুটকেস হাতে উঠে দাঁড়ালো কুমার।

আমি অচঞ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম। যাবার সময় ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কুমার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

কুমার চলে যাবার পর বারান্দায় এলাম। ডেকচেয়ারটায় দেহটা তির্যকভাবে এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

কত সহজে কুমার চলে গেল। কত নিঃশব্দে সে যবনিকার আড়ালে সরে গেল। আর আমি? তার নাটকীয় প্রস্থান প্রত্যক্ষ করলাম শান্ত মনে।

মনে পড়লো এলার কথা। সে বলতো, এখানে সবটাই বাইরের—প্রেম, ভালোবাসা বলে কোন কিছু নেই। মুদি-ময়রার দোকানে খদ্দের আসে আমাদের কাছেও বাবুরা আসে। আমরা ভালোবাসার অভিনয় করি, বাবুরা সে অভিনয়ে মুগ্ধ হয়। কিন্তু তাদের আসল পাওনাটা তারা উসুল করে দেহের ওপর দিয়ে।

এলা একা নয়, নিষিদ্ধ গলির সবার মুখে ওই একই কথা। আমি তাদের সঙ্গে কখনো একমত হতে পারিনি। আমি ভাবতাম, হয়তো এখানে প্রেম ভালোবাসা মিথ্যে, কিন্তু প্রেম আর ভালোবাসার অভিনয়টা তো সত্যি। আর অভিনয়েরও তো মূল্য আছে। সে মূল্য সাময়িক যদিও। আবার এ-ও ভাবতাম, জীবনের সবটাই তো সাময়িক। সুতরাং সবকিছু যেখানে সময়-সীমায় বাঁধা, তখন সেখানে চিরায়ত কিছু খোঁজার চেষ্টা কেন।

দীপক সান্যালকে ভালোবেসেছিলাম, এ কথা তো আমার জীবনে সূর্যের মতই সত্য ছিল। অতনু পাকড়াশী আমাকে ভালোবাসতো, তা-ও তো মিথ্যে ছিল না। অথচ সবটাই মিথ্যে হলো, মূল্য হারালো।

বকখালিতে সমুদ্রবেলায় দাঁড়িয়ে দীপক বলেছিল, মালা—তুমি আর আমি, যেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এমনি এক আনন্দের মধ্যেই থাকি।

'জীবনের শেষ দিন' কথাটা সেদিন সেই মুহূর্তে আমার ভালো লাগেনি। বলেছিলাম, শেষের দিন আমাদের কখনো আসবে না দীপক।

' অথচ আশ্চর্য, যে দীপকের ইচ্ছার কাছে আমি আমার কুমারী-সত্তা অঞ্জলি দিয়েছিলাম, সেই দীপক আমাকে খড়-কুটোর মতো কত সহজে ত্যাগ করলো। সেদিন যা মনে হয়নি, আজ তাই মনে হয়—সেদিনে দীপকের ইচ্ছার কাছে কুমারী-সত্তা অঞ্জলি নয়—তার লালসার আগুনে নিজেকে আহুতি দিয়েছিলাম। তার মধ্যে আমার মনেও আদিম আনন্দভোগের ইচ্ছার তাড়না ছিল।) দীপক আমার

কাছে যেমন অপরাধী, তেমনি আমি নিজের কাছেও। দীপককেও আমি ক্ষমা করতে পারি না, পারি না আমাকেও।

আমি গর্ভবতী হলাম। মনে মনে ভয়টা জেগেছিল প্রথম দিন থেকেই, কিন্তু ভয়টা আরো আঁকড়ে ধরলো মাস দেড়েক বাদে যখন হোস্টেলে খাবার টেবিলে হঠাৎ বমি করে ফেললাম।

আরো বান্ধবীরা যারা কাছে ছিল, তারা হৈ হৈ করে ছুটে এলো। কেউ আমার মাথা ধরলে, কেউ এঁটো গ্লাসের জল মাথায় ঢাললো, কেউ গরমে কষ্ট হচ্ছে ভেবে পাখার নিচে শোয়াতে চাইলো।

সেদিন আস্তে আস্তে উঠে চলে এলাম নিজের ঘরে। যে ঘরে রাকা দত্তও থাকে। রাকা দত্ত বিবাহিতা—বছর খানেক হলো বিয়ে হয়েছে। স্বামী কলকাতার বাইরে থাকে। রাকাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিল স্বামী, কিন্তু রাকা যেতে চায়নি। জানিয়েছিল, তার পড়ার আগ্রহের কথা। স্বামী খুশি-মনে বলেছিল, রাকা, তোমার কাছে আমি এই কথাটাই আশা করেছিলাম।

আসছে বছরে বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষা রাকার।

খাবার ঘর থেকে যখন নিজের ঘরে এলাম, তখন ঘরে ছিল না রাকা।

বান্ধবীরাও চলে গেলে আমি একলা ঘরে ভাবতে বসলাম। ভাবনাটা কিন্তু একটা বিন্দুতেই স্থির। যে ভয়টা ছিল আমার মনে, সেইটাই সত্যি হতে চলেছে। গর্ভবতী আমি।

আর দেহের ওপরেও যেন পরিবর্তনের সূচনা। অন্তত চোখের কোণ তো স্পষ্ট বলে দিচ্ছে একটা কিছু ঘটেছে। সুতরাং এরপর।

দীপকের সঙ্গে দেখা হলে, আজই আমি বলবো, আর অপেক্ষা নয় দীপক, এবারে যা হোক একটা কিছু করো।

কিন্তু আজ তো ক্লাস নেই। তবে দীপক বিকেলের দিকে নিশ্চয়ই কফি হাউসে আসবে।

শরীরটা ভালো ছিল না, তবু বিকেলের দিকে কফি হাউসে

এলাম। দেখলাম দাপকেরা কথা বলছে কোণের টেবিল ঘিরে। তার মধ্যে মিনতি হাজরাও রয়েছে।

মিনতিকে আজকাল ঠিক সহ্য করতে পারি না। তবে মৌখিক সম্পর্কটা ঠিকই বজায় রেখেছি।

আমাকে দেখেই মিনতি যেন খুব বেশী উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলো। তার এই উচ্ছ্বাস আমার কাছে উপহাসের মতো শোনালো। কিন্তু সেই মুহূর্তে মিনতির উচ্ছ্বাসের সামিল হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

দীপকের পাশেই বসলাম। দীপক একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি লক্ষ্য করলো জানি না। বললে, তোমাকে আজ কেমন যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে মালা।

—না, না। ওটা তোমার ভুল। মিনতির দিকে লক্ষ্য রেখে বললাম, কি মিনতি, আমাকে কি ক্লান্ত মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ, একটু। মিনতি একটু চুপ করে থেকে অনুচ্চকণ্ঠে বললে, বমি হলে একটু ক্লান্ত দেখায় বৈকি!

বমির খবরও এই কফি হাউসের টেবিলে! কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল। দীপকের মুখেও শুকনো হাসি। আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠলো। ইচ্ছে হলো, গলায় আঙুল দিয়ে এখানেও খানিকটা বমি করে দিই।

—তোমার সঙ্গে কথা আছে দীপক। একটু বাইরে আসবে?

—আরে বলোই না কি কথা!

—নিছক ব্যক্তিগত।

—এবং গোপনীয় আমি উঠে দাঁড়াবো এমন সময় মিনতি বলে উঠলো।

দীপককে নিয়ে কফি হাউস থেকে বেরিয়ে এলাম। কলেজ স্কোয়ারে। একটি বেঞ্চে পাশাপাশি বসলাম। কোন রকম ভূমিকা না করেই বললাম আমার ভয়ের কথাটা। দীপক হাসলো। বললে, ও কিছু না—ওটা নিছক তোমার মানসিক বিভ্রান্তি। একদিনে কিছু হয় নাকি!

—তুমি জানো না দীপক, সত্যি মনে হচ্ছে—

কথা শেষ করতে দিলে না দীপক। নির্লজ্জের মতো আমার নরম গালে আঙুলের টোকা দিয়ে বললে, বেশ তো চলো না, আর একদিন বকখালি ঘুরে আসি। অত দূর না যেতে চাও, চলো ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটে।

—আমি চললাম দীপক।

দীপক আমার হাত টেনে ধরলো। বাধ্য হয়ে বসলাম। একটু বাদেই দেখলাম, মিনতি হাজরা, টুকলোদা, মনোরম বাগচিরা গল্প করতে করতে এদিকেই আসছে।

আর নয়। উঠে দাঁড়ালাম। চলে যাবো বলে পা বাড়িয়েছি, শুনতে পেলাম মিনতি হাজরার ডাক, এই মালা—শোন।

কিন্তু, আমি আর দাঁড়ালাম না। বিপরীত দিকে চলতে আরম্ভ করে সোজা বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীটে এসে পড়লাম।

কয়েকটা দিন কাটলো। এরপর আবার উপসর্গ আরম্ভ হলো। যখন-তখন বমির বেগ আসে। এমন কি ক্লাসের মধ্যেও। অবস্থাটা চরমে পৌঁছলো একদিন রাত্রে খাবার সময়ে। সবে কয়েক গ্রাস ভাত তরকারি মুখে তুলেছি, এমন সময় হড়হড় করে বমি হয়ে গেল। এ ছাড়া আরো যারা খেতে বসেছিল, তাদের অনেকের খাবার নষ্ট করলাম। সেই মুহূর্তে কি যে হলো আমার, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করছিল।

কিন্তু আশ্চর্য ভালো রাকাদি। সেই অবস্থায় আমাকে ঘরে নিয়ে এলো। আমার মুখ-হাত ধুইয়ে বিছানার ওপর শুইয়ে দিলে। আমি বিছানায় শুয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলাম।

রাকাদি বললে, কাঁদছো কেন? কি হয়েছে?

বললাম, রাকাদি তোমাকে আমি সব বলবো—

রাকাদি বললে, বলতে হবে না বোন, আমি বুঝতে পেরেছি।

তারপরই চুপ করে গেলাম। রাকাদির দুটি হাত সজোরে

চেপে ধরে বললাম, আমার কি হবে রাকাদি ?

রাকাদি বললে, সেই স্কাউণ্ড্রেলটার নাম বলতে পারিস ?

—দীপক সান্যাল।

—ও তো একটা রোগ্—।

—আমি বুঝতে পারি নি।

এই সময়ে মনে এলো রেবা সোমের কথা। সে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। আরো একজন সতর্ক করেছিল আমাকে, সে হলো অতনু পাকড়াশী। কিন্তু তাদের কথা শুনি নি আমি। ভেবেছিলাম, ঈর্ষা নিয়েই তারা আমাকে সে-সব কথা বলছে। আজ এখন যদি রেবা আর অতনুকে পেতাম, ক্ষমা চাইতাম তাদের কাছে। কিন্তু এখন রাকাদি ছাড়া আর কেউই আমার কাছে নেই।

—রাকাদি, আমার কি হবে ?

রাকাদি নীরব।

—কথা বলছো না কেন রাকাদি ?

—মালা, ভুল যখন করেছ, তখন মাশুল দিতে হবেই। রাকাদি একটু চুপ করে থেকে বললে, দীপক রাজী হবে তোমাকে বিয়ে করতে ?

—রাকাদি, আজ যখন আমার নিজের ওপরে বিশ্বাস নেই, তখন আর একজনকে বিশ্বাস করবো কেমন করে ?

—তবুও বিশ্বাস হারাতে নেই মালা। বিশ্বাস বাদ দিয়ে জীবনকে চিন্তা করা যায় না।

নিজের মধ্যে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম। একদিন এই বিশ্বাস নিয়েই এলাম দীপকের কাছে। কলেজের করিডোরে দাঁড়িয়ে তাকে বললাম, দীপক, তুমি আমায় বিয়ে করবে ?

দীপক যেন চমকে উঠল।—বিয়ে ? ওই পুরনো সংস্কারটাকে কি কেউ এই বয়সে আঁকড়ে ধরে।

—তবে ?

—তবে আবার কি ?

—তুমি আমার কথাটা একবার ভেবে দেখেছ ? বেহায়ার মতো স্পষ্ট করেই বললাম, আমার পেটে যে তোমার বাচ্চা।

—ওটা তোমারও বটে।

দীপককে বড্ড বেশী রূঢ় মনে হলো। বললাম, কিন্তু এরপরের কথাটা ভেবে দেখেছো কি ?

—ভাববো আবার কি ? হাজারখানেক টাকা না হয় তোমার জন্যে খরচা হবে। কলকাতা শহরে তো নার্সিংহোমের অভাব নেই, যেখানে কর্ণেরা জন্মায়।

সেই মুহূর্তে আর্তনাদ করতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু সে ইচ্ছের টুটি চেপে ধরলাম। নিষ্ফল আক্রোশে দীপককে বেশ কয়েকটি কড়া কথা শুনিয়ে চলে এলাম হোস্টেলে। রাকাদিকে বললাম সব কথা। শুনে রাকাদি আমাকে বললে, মালা, জীবনে সত্যকে কখনো বিসর্জন দিতে নেই। তুমি যা করেছ সবই জানাও তোমার মাকে।

—মাকে।

– হ্যাঁ। মা-বাবার চেয়ে আপন কেউ নেই।

– না, না এ আমি পারবো না। রাকাদি, তার চেয়ে আত্মহত্যা করাটা আমার কাছে সহজ।

—এর পরেও আত্মহত্যার চিন্তা ? রাকাদি হেসে বললে, মালা, বাঁচার কথা ভাবো।

—বেশ তো, তুমি বলো আমি কি করে বাঁচবো ?

—তোমাকে নিজেই বাঁচতে হবে মালা।

কেমন যেন ভেঙে পড়লাম। আমি করবো বাঁচার চিন্তা ? আমি যে বেঁচে আছি, এই কথাটাই ভুলতে বসেছি।

সেই রাত্রে রাকাদি আরো বললে, মালা, হোস্টেলে তোমাকে নিয়ে নানা কথা উঠছে, আমার মনে হয়, এখানে থাকা তোমার ঠিক নয়।

—কিন্তু কোথায় যাবো রাকাদি ?

—বাড়ি চলে যাও, মা বাবার কাছে।

—তারপর ?

—হয়তো অনেক ঝড় উঠবে তোমাকে নিয়ে, অনেক কিছু সহ্য করতে হবে, তারপর হয়তো দেখবে, তোমার বাঁচার জন্য একটা পথ তাঁরাই করে দিয়েছেন।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার জন্য রাকাদির চিন্তার অন্ত ছিল না। কিন্তু আমি যে বাড়িতে মা বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো, মনটাকে কিছুতেই তার জন্যে প্রস্তুত করতে পারছিলাম না।

আর এই যখন মানসিক অবস্থা, তখন বাঁচার মতো একটা পথ পেলাম হোস্টেলের বুড়ি ঝি দামিনীর কাছে।

দামিনী আমাকে আড়ালে ডেকে বললে, দিদিমণি, আমার চোখে সব ধরা পড়ে। আমি জানি তোমার কি হয়েছে। বলতো সব পোস্‌কার করে দিই।

একটু বিস্মিত হলাম দামিনীর কথায়।

দামিনী একগাল হেসে বললে, কত পোস্‌কার করলাম—এই হোস্টেলে কি কম কাণ্ড ঘটে।

—তুমি পারবে দামিনী ?

কিচ্ছু ভয় নেই দিদিমণি, একটা বড়ি খেতে দেব, আর—বলে দামিনী আমার কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে জঘন্য একটা প্রক্রিয়ার কথা বললে। যাই হোক, আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম।

কিন্তু স্বর্গের পথটা যে নরকে গিয়ে ঠেকেছে, তা কি আগে জানতাম। দামিনীর দেওয়া বড়ি খেলাম। শিকড়টাও গোপনে হাত পেতে নিলাম। তারপর যা হবার তাই হলো।

একটা দিন আর রাত, কোনমতে চাপা যন্ত্রণা নিয়ে সামলে ছিলাম। তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে আরম্ভ করলাম।

রাকাদি ঘুমিয়ে ছিল, জেগে উঠল আমার কাতরানিতে। আলো

জ্বেলেই চমকে উঠলো। আমার কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্তর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আর সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা। বিশেষ করে তলপেটে।

—মালা! কি করেছো তুমি?

—রাকাদি, আমি বাঁচবো না রাকাদি—মরে যাবো।

—তোমার মরাই ভালো!

রাকাদি কখনো এমন কথা বলেনি। বলতে পারে, তাও আমার স্বপ্নের অতীত। আমি আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে রাকাদির দু হাঁটু জড়িয়ে ধরলাম। পাগলের মতো কত কি বলতে লাগলাম। কিন্তু রাকাদি কেমন যেন চুপ করে রইল।

একটু বাদেই রাকাদি চলে গেল বাইরে। ফিরে এলো খানিক বাদে। সঙ্গে একজন বিবাহিতা ভদ্রমহিলা। যাঁকে এর আগে রাকাদির কাছে আসতে দেখেছি। নামটাও মনে পড়ছে—সুদর্শনা। হ্যাঁ, আরো মনে পড়ছে, রাকাদিই বলেছিল, সুদর্শনা একটি নার্সিং-হোমের সঙ্গে যুক্ত। সে নিজেও নার্স।

হোস্টেল থেকে ডাক্তার চৌধুরীর নার্সিংহোম। রাকাদিই সব ব্যবস্থা করেছে। আর সেই রাত্রে গোপনে আমাকে হোস্টেলের বাইরে আনার ব্যবস্থা রাকাদির জন্যেই সম্ভব হয়েছিল।

রাকাদিকে বলেছিলাম বাড়ির ঠিকানা। না বলে পারিনি। রাকাদিই চিঠি লিখলো আমার মাকে। আমি যে অসুস্থ হয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছি, শুধু এই ক'টি কথাই লেখা ছিল। মা, কাকা, কাকিমা সবাই ছুটে এলেন।

আমার ছোট ভাইটিও এলো, সেই সঙ্গে তিন বছরের ঝুমুর। আমার কাকিমার মেয়ে। যে জন্মালে ষোল বছর বয়েসেও হিংসে হয়েছিল। কিন্তু বাবা আসেনি।

কিন্তু কাকিমা ছাড়া কেউ-ই আমার কাছে এলো না। আর সবাই ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিল।

কাকিমা আমার বেডের পাশে এসে বসলো। আমার কপালে

হাত দিলে। জিজ্ঞাসা করলে, এখন কেমন আছিস?

কথা বলবো কি! কথা বলতে পারলাম না। আমার দুচোখে তখন জল টলমল করছে। কণ্ঠস্বরও কান্নার দুরন্ত আবেগে রুদ্ধ।

—কাঁদছিস কেন? দুদিন পরেই ভালো হয়ে উঠবি।

সেই কান্নার মধ্যেও আমি হাসতে চেষ্টা করলাম।

—যা হবার হয়ে গেছে। কাকিমার কণ্ঠে সেই আগের মতই মমতার স্পর্শ।—কিছু ভাবিস নে, আমি তো আছি।

—মা, কাকা ওরা আসছে না কেন?

—সবাই তো আর আমি নই। তাছাড়া খোকন রয়েছে, ঝুমুর এসেছে—বুঝতেই তো পারছিস।

—একবার ঝুমুরকে নিয়ে আসবে?

—থাক না। পরে আসবে। ছোটদের এখানে ঢুকতে দেয় না।

কাকিমা বসে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। আর আমি একটি হাত কাকিমার দিকে ছড়িয়ে দিয়ে নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগলাম।

যে মেয়ে কাঁদতে জানতো না, আজ সেই মেয়ের কান্না থামে না। কাকিমা কত রকমে বোঝালো, যা হবার তা হয়েছে। এখন নতুন করে আবার সব কিছু ভাবতে হবে, তারপর আরো কত কথা। প্রতিটি কথার মধ্যেই অকৃত্রিম মমতার স্পর্শ।

হয়তো কাকিমা আরো কথা বলতো, কিন্তু সিস্টার এসে জানাল, রোগিনীর সঙ্গে বেশী কথা বলা চলবে না।

কাকিমা অগত্যা উঠে দাঁড়ালো। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, আজ আমি যাচ্ছি রে মালা। কাল আবার আসবো।

বললাম, একবার ঝুমুরকে দেখাবে না?

কাকিমা কি যেন ভাবলো। বললে, থাক না—ঝুমুরকে নিয়ে এলে আবার খোকন আসার জন্যে জিদ ধরবে।

কাকিমার একটা হাত চেপে ধরলাম। বললাম, কাকিমা, আমি কোন মুখে বাড়ি যাবো? আমি যাবো না—মা, বাবা,

ছোটকাকার সামনে দাঁড়াতে পারবো না।

কাকিমা বললে, সব ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দে মালা।

—তাই দিলাম।

বলে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করলাম। এতক্ষণে বুকটা যেন একটু হালকা বোধ হলো।

কাকিমা চলে গেল। দরজার দিকে তাকিয়ে রইলাম, যদি মাকে দেখতে পাই, যদি খোকন আর ঝুমুরকে চোখে পড়ে। কিন্তু কাকেও দেখতে পেলাম না। শুধু শুনতে পেলাম খোকনের গলা, আমি একবার দিদিকে দেখবো কাকিমা।

কাকিমার কথা শুনতে পেলাম না। খোকনও এরপর চুপ করে গেল। আমিও মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছি। রাকাদি রোজই আসে। কাকিমাও। কিন্তু মা, কাকা, খোকন, ঝুমুর ওরা কেউ-ই আসে না। একদিন রেবা সোমও এলো। রেবাকে দেখেই তার পা দুটি জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু রেবার সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে মনে হলো, ওর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয় না। ও কারো কোন অপরাধ নিতে জানে না।

—রেবা তুমিও এলে ?

—না এসে কি করি বল ? তুমি অসুস্থ, শুনেও কি আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি ?

বলে রেবা আমার একখানি হাত টেনে নিয়ে বললে, ভালো হয়ে উঠে আমার সঙ্গে দিন কতক ঘাটশীলায় গিয়ে থাকবে—ওখানে আমাদের বাড়ি আছে।

আমাকে কোন কথা বলার অবসর দিলে না রেবা। নিজে থেকেই ঘাটশীলার কথা বলতে আরম্ভ করলো। পাহাড়, সুবর্ণরেখা নদী, অরণ্য, তারপর আরণ্যকের বিভূতিভূষণের প্রসঙ্গ। বুঝতে পারি, রেবা আমাকে আমার প্রসঙ্গ তুলতে দিতে চায় না।

তাতে আমার ব্যথা যত না বাড়বে, তার চেয়ে রেবাই বেশি ব্যথা পাবে। রেবা প্রথম থেকেই আমার ভালো চেয়েছিল। সতর্কও করেছিল। কিন্তু আমি তাকে অপমান করেছিলাম। তা সত্বেও সে অপমান গায়ে মাখেনি সে। আর আজ সব কিছু শোনার পরেও সে এসেছে প্রসন্ন মনে।

আমার চোখে জল দেখে রেবা বললে, চোখের জল ফেলতে নেই মালা। ওটা দুর্বলতার চিহ্ন।

বললাম, নিজেকে সবলা বলে আর দাবী করি না।

রেবা বললে, আমি কিন্তু তোমাকে সবলা বলেই মেনে নিয়েছি।

আরো অনেক কথা বললে রেবা। যে কথার মধ্যে একটিবারও দীপক কিংবা মিনতি হাজরার নাম করলো না। আমার জীবনে যে অঘটন ঘটেছে, তার জন্যে সহানুভূতিসূচক একটি কথাও উচ্চারণ করলো না। শেষটা আমিই বললাম, রেবা তুমি যদি একটু ঘৃণা দেখাতে পারতে তাহলে আমি স্বস্তি পেতাম। আমার শুধুই মনে হচ্ছে, তুমি, রাকাদি, কাকিমা আমাকে অহেতুক করুণা করছো।

রেবা ঘড়িতে সময় দেখে উঠে দাঁড়ালো। বললে, আজ আমি যাই মালা। পারি তো কাল আবার আসবো।

—পারি তো নয় রেবা, কাল তোমার আসা চাই।

রেবা চলে যাচ্ছিল। ডেকে বললাম, অতনুর সঙ্গে দেখা হয় না তোমার?

—না। সে তো কলেজ ছেড়ে দিয়েছে।

—যদি দেখা হয়, একবার বোলো আমার কথা।

—আচ্ছা।

রেবা চলে গেল। আমার মনও হারিয়ে গেল অতনুর চিন্তায়। যে অতনু আমাকে ভালোবাসতে চেয়েছিল। যাকে অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম।

নার্সিংহোম থেকে ছুটি পাওয়ার দিন এগিয়ে এলো। আবার

একটা চিন্তা আমার কাছে দুশ্চিন্তা হয়ে দেখা দিল। নার্সিংহোম থেকে কোথায় যাবো। বাড়ি? কিন্তু কাকিমা তো আজকাল আর বাড়ি যাওয়ার কথা বলে না। বরং আমাকে বলেছে, আমাকে দিন কতকের জন্যে হাওয়া বদল করতে বাইরে কোথাও যাওয়ার কথা। আবার একদিন এমনও বলেছিল, কাকিমা তার ছোটবোনের কাছে পাটনায় আমাকে পাঠাবে।

এ তো গেল কাকিমার কথা। আরো ভাবতাম, মা, কাকা, বাবা এরা তো একবারও এলো না আমাকে দেখতে। এমন কি ছোটভাইটাকেও আসতে দেয়নি তারা। মা, ছোটকাকা আমাকে না দেখেই দেশের বাড়িতে চলে গেছে। হয়তো কাকিমা নিজের ইচ্ছেতেই কলকাতায় বাপের বাড়িতে আছে। কাকিমাকে তো জানি, অমন নরম আর উদার মনের মেয়েমানুষ কমই দেখা যায়।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম কাকিমাকে—কাকিমা তুমি আমায় পাটনায় যেতে বলছো কেন? হাওয়া বদলের কথাও তো কোনদিন বলতে না?

কাকিমা বুদ্ধিমতী। আমার প্রশ্ন অদ্ভুতভাবে এড়িয়ে গেল; বললে, ওটা আমার মুখের কথা—আমার কথাই তো সব নয়।

আমি না হেসে পারলাম না। বললাম, এই সপ্তাহের শেষেই তো আমার ছুটি—আজ মঙ্গলবার, হয়তো শুক্র কিংবা শনিবার এখান থেকে চলে যেতে হবে। তখন বুঝতে পারবো কার ইচ্ছেয় কোথায় যেতে হচ্ছে। তবে একটা কথা শোনো, আমার আর কোন ইচ্ছে নেই। আমি এখন আমার কাছে একটা জীবন্ত মৃতদেহ।

লক্ষ্য করলাম, কাকিমার মুখে চিন্তার রেখা। অথচ কিছু বলতেও পারছে না। আমি কাকিমার একটা হাত সজোরে নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বললাম, আমি জানি কাকিমা, তুমি চিরদিনই আমার থাকবে।

কাকিমার দুটি চোখ সজল হয়ে উঠলো। তবুও চোখের জল গোপন করার চেষ্টা তার।

আর বসলো না কাকিমা। ঝুমুর তার দিদিমার কাছে থাকতে চায় না বলে উঠে পড়লো। আমিও আর আটকে রাখতে চাইলাম না কাকিমাকে।

যাবার আগে সে জানিয়ে গেল, রোজই সে আসবে।

কাকিমা, রেবা আর রাকাদি রোজই আসতো। কথা বলতো, গল্প করতো। এই তিনজন ছাড়া আরো একজনকে দেখতাম, সে এই নার্সিংহোমেরই একজন—সুদর্শনাদি। এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল আমাকে নিয়ে, যার সবটাই আমার ভুলের জন্যে, অথচ সমবেদনা নিয়ে সুদর্শনাদি আমার জন্যে কত কি করে গেল। একদিন সুদর্শনাদিকে বলেছিলাম, আপনার মধ্যে আমি এক আশ্চর্য মানবীকে খুঁজে পাই সুদর্শনাদি।

সুদর্শনাদি হেসে বলেছিল, আমি কল্পলোকের কেউ নই মালা, এই পৃথিবীরই একজন। তোমার সঙ্গে আমাব কোন তফাৎ নেই।

কিন্তু সুদর্শনাদি কখনো বেশী কথা বলতো না। আগেও দেখেছি, রাকাদির কাছে যখন যেত-আসতো, এখন তো কাছ থেকে নিবিড় ভাবে দেখছি, একটা সুন্দর অনাবিল মন নিয়েই সুদর্শনাদি নিজের কাজ করে চলেছে। যার মধ্যে ফাঁকি নেই, কারচুপি নেই। সবচেয়ে বড় কথা, যান্ত্রিকতা নেই। বরং সব কিছুতে তার মনের স্পর্শ আছে। যে স্পর্শ ক'দিন থেকে আমি অনুভব করেছি, উপলব্ধি করেছি।

নার্সিংহোম থেকে ছুটি পাওয়ার দিন।

সকাল থেকেই ভেবেছিলাম কাকিমা ছাড়া বাড়ির কেউ আসবে না। আসবে রাকাদি, রেবা। আর সুদর্শনাদি তো আছেই।

কিন্তু বেলা চারটেয় ছোটকাকাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বিস্মিত হলাম। ছোটকাকা একাই এসেছে।

—কাকিমা এলো না ছোট্‌কা ?

—না। ছোটকাকার কণ্ঠস্বর একটু কর্কশ শোনালো।

—কেন, কাকিমা তো বলেছিল, আসবে।

—আমিই এলাম। ছোটকাকা বললে, তুমি তৈরী হয়ে নাও মালা, আমি অপেক্ষা করছি বাইরে।

ছোটকাকা আমাকে 'তুই' সম্বোধন করে। 'তুমি' সম্বোধনটা হঠাৎ কানে কেমন বেসুরো লাগলো। অথচ এ নিয়ে কাকার ওপর তো কথা বলতে পারি না। তারপর এই সময়। যখন আমি কিছু বলার অধিকারটুকু হারিয়ে বসে আছি।

তৈরী হওয়া বলতে শাড়িটা একটু গুছিয়ে পরা, আর মাথার চুলগুলো একবার ওপর-ওপর আঁচড়ে নেওয়া। তারপর সুদর্শনাদির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসা।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নামার মুখেই দেখলাম রাকাদি আর রেবা আসছে। ছোটকাকাকে বললাম, তুমি একটু দাঁড়াও ছোট্‌কা, আমি রাকাদি আর রেবার সঙ্গে কথা বলে আসছি।

—বেশ তো, বাইরে এসেই কথা বলবে। ছোটকাকাকে বড্ড বেশী গম্ভীর মনে হলো।

এরপর আর ছোটকাকাকে কিছু বলতে পারলাম না। রাকাদি আর রেবার সঙ্গে নিচে নেমে এলাম।

কত কথা বলার ছিল, কিন্তু সব কথা এক কথাতেই শেষ হয়ে গেল। রাকাদি আর রেবা, দুজনের দুটি হাত একসঙ্গে ধরে বললাম, তোমরা কামনা করো আমি যেন বাঁচতে পারি।

রাকাদির চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরে পড়লো। আর রেবা মাথা নীচু করে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

ট্যাক্সিতে ওঠার সময়েই ছোটকাকা বললে, তোমাকে আপাতত আমার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ যেতে হবে।

—মুর্শিদাবাদ। কেন?

—এখনো তোমার প্রশ্ন করার মতো মন আছে? ছোটকাকা একবার ফিরেও তাকালো না আমার মুখের দিকে। বলে, যদ্দিন

না তোমার একটা হিল্লে হয়, তদ্দিন বাইরেই থাকতে হবে।

ট্যাক্সিতে ওঠার মুহূর্তে মনে হলো, আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করি। চীৎকার করে বলি, আমার বাইরের ভুলটাকেই তোমরা শুধু দেখলে। মনটাকে দেখতে চাইলে না। একটা ভুল, তা সে যত বড় হোক না কেন, তার প্রায়শ্চিত্ত তো আছে। তারও সুযোগ তোমরা দিলে না। আমি কি তোমাদের কাছে আবর্জনার সামিল, না কি জড়পদার্থ?

মনের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড়, কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বলতে পারলাম না।

ট্যাক্সি ছাড়ার মুখে একবার পিছন ফিরে তাকালাম। ফুটপাথের ওপর রাকাদি আর রেবার সঙ্গে সুদর্শনাদিকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

ভুল আমি করেছিলাম, হয়তো আমার পক্ষে করা অসম্ভব কিছু ছিল না, কিন্তু আমার অভিভাবকরা এতবড় ভুল কেন যে করলো, তা আমার বিচার-বুদ্ধির বাইরে। ছোটকাকার মত বুদ্ধিমান মানুষই বা আমাকে কেন মুর্শিদাবাদে রেখে এলো তাও বুঝলাম না।

যে বাড়িতে গেলাম, সেটি আমার দূর-সম্পর্কের পিসিমার বাড়ি। যাঁকে আমি চোখে দেখিনি, তবে নাম শুনেছিলাম। জানতাম, ফুলপিসি বলে। আর এ-ও জানতাম ফুলপিসির কোন ছেলে মেয়ে নেই। একাই থাকতেন। ফুলপিসির স্বামী অনেক টাকাকড়ি রেখে গেছেন, ব্যাঙ্ক থেকে তারই সুদ আসে, যে টাকা ফুলপিসি এন্তার খরচ করেও শেষ করতে পারেন না।

সেই ফুলপিসির কাছেই আমাকে রেখে গেল ছোটকাকা। প্রথমে এসেই বুঝলাম, ফুলপিসিকে আমার সব কথাই আগে থেকে জানানো হয়েছে।

গঙ্গার ওপরে ফুলপিসির বাড়ি। সেকেলে ধরনের বিরাট বাড়ি। আর এই বিরাট বাড়িতে মানুষ বলতে ফুলপিসি আর

দুজন দারোয়ান। এছাড়া আর একজন অনাথা বর্ষীয়সী মহিলাও আছে, ফুলপিসির সঙ্গে ছায়ার মত জড়িয়ে।

ছোটকাকা একটা দিন আর একটা রাত ছিল এ বাড়িতে। যখন চলে গেল, আমি প্রণাম করে বলেছিলাম, ছোট্‌কা, আবার তোমাদের দেখতে পাবো তো?

ছোটকাকা কোন কথা বলেনি। নীরবে গম্ভীর মুখে চলে যাচ্ছিল, আমি পিছু ডেকে বললাম, কাকিমাকে বোলো আমার কথা।

ছোটকাকার কাছ থেকে তবুও সাড়া পেলাম না।

মুহূর্তে সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে গেল। চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম, ছোট্‌কা, আমি মরে যাবো, ছোট্‌কা।

তবুও ছোটকাকার কাছ থেকে একটি কথাও শুনতে পেলাম না। আমারই সামনে দিয়ে ছোটকাকা চলে গেল।

আমি ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে তখনো চোখের জল ফেলছিলাম। ফুলপিসি এলেন পিছনের দরজা দিয়ে। এসেই আমার পিঠে হাত রাখলেন।—কিরে, কাঁদছিস কেন? আয়, আমার সঙ্গে ঠাকুরঘরে আয়।

ফুলপিসির মুখের দিকে তাকালাম। যে মুখে কোন কল্যাণী নারীর ছায়া দেখতে চাইলাম, কিন্তু বৃথা সে আশা। যদিও ফুলপিসি আমাকে ঠাকুরঘরে ডাকলেন, তবুও মনে হলো, ফুলপিসির আশ্রয়ে আমার সুখ নেই।

ফুলপিসিকে অনুসরণ করে ঠাকুরঘরে এলাম।

মাসখানেক গেল। ফুলপিসির বাড়িতে নতুন অতিথি এলো। নাম ইন্দ্রজিৎ। বয়েসও বেশী নয়, তিরিশের মধ্যে। শুনলাম, সম্পর্কে ফুলপিসির একরকম ভাসুরপো। আর এ-ও বুঝলাম, ফুলপিসি তাকে খানিকটা আত্মজের মতো মনে করেন।

প্রথমে আমার মনে হয়েছিল হয়তো ইন্দ্রজিৎকে এ বাড়িতে দু এক দিনের বেশী থাকতে দেবেন না ফুলপিসি। অন্তত আমার

মত দুষ্টু মেয়ে যেখানে আছে। কিন্তু দু'চারদিন বাদেই বেশ বুঝতে পারলাম, ইন্দ্রজিৎ সহজে এ বাড়ি ছেড়ে যাবে না। আর আমার ওপর তার একটু নজরও পড়ে গেছে ইতিমধ্যে।

সত্যিকথা বলতে কি, ইন্দ্রজিৎকে আমি কোনদিক থেকে পছন্দ করিনি। বরং তাকে দেখলেই মনের মধ্যে কেমন একটা ঘৃণা পাক দিয়ে উঠতো। জোঁক জাতীয় কিছু দেখলে যেমন হয়, তেমন।

অথচ ইন্দ্রজিৎকে আমার প্রয়োজনে ব্যবহার করলাম একদিন। দিনের পর দিন ফুলপিসিকে বলে একটা খাম বা পোস্টকার্ড সংগ্রহ করতে পারিনি, কিন্তু ইন্দ্রজিৎকে বলতে গোপনে সে আমাকে খাম পোস্টকার্ড সংগ্রহ করে দিল। চিঠি লিখলাম তিনটি। একটি কাকিমাকে, রেবা আর রাকাদিকেও লিখলাম। কিন্তু রাকাদি ছাড়া আর কারো কাছ থেকে উত্তর পেলাম না। রাকাদির চিঠির মধ্যে পেয়েছিলাম একটি সুন্দর-মনের স্পর্শ। আর এমনও লিখেছে সে, যদি কখনো কোন প্রয়োজন আসে যেন তাকে জানাই।

রাকাদির চিঠিটা পড়বার পর মনে হয়েছিল, রাকাদি মানবী নয়, দেবী।

যাই হোক, ইন্দ্র এ বাড়িতে আসার পর দিন পনেরো কেটে গেছে। আমার সঙ্গে তাই মেলামেশাটাও বেড়েছে। ফুলপিসি সবই দেখছেন, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোন বাধা পাইনি। বরং আমরা কথা বলছি দেখলে তিনিই সরে যেতেন।—গল্প করছো, করো—আমি আর তোমাদের কথার মধ্যে থাকবো না—এমন ধরনের কথাও বলতেন। বুঝতে পারতাম না তাঁর মনের ইচ্ছে কি। আবার এমনও ভাবতাম, হয়তো আমার উদ্ধারের জন্যেই আনা হয়েছে ইন্দ্রজিৎকে।

তখন আমার মনটা এমনই বিষিয়ে উঠেছে, আমার মধ্যে সুস্থ মেয়ের কোন লক্ষণই ছিল না। আর কেবলই ভাবতাম আমার মা, বাবা, ছোটকাকার কথা। যারা আমাকে আবর্জনার মতো দূরে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু কাকিমার কথা মনে এলেই

কেমন কান্না পেত। মনে হতো, কাকিমা আমাকে তার স্নেহের আঁচলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। কারণ, কাকিমার চাওয়াটাই তো সব নয়।

আর যখন মনে হতো বাড়ির কথা, মা-বাবার অবহেলার কথা, তখনই কেমন একটা নোংরা প্রতিশোধের ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠতো। মনে হত, আমি যদি একেবারে বয়ে যাই, তাতেই বা দোষ কি।

কিন্তু আমাকে কিছুই করতে হলো না। কিছুদিন না যেতেই একদিন মা আর ছোটকাকা এসে হাজির। মাকে পেয়ে প্রথমটা কি যে আনন্দ হলো, তা বলবার নয়। মাকে জড়িয়ে ধরলাম। ছোট মেয়েটির মত মায়ের বুকে মাথা গুঁজে কাঁদলাম। কিন্তু মা কেমন যেন পাথরের মতো। আমার কান্নাতেও তার পাষাণ-মন গললো না। শুধু শুকনো গলায় বলতে শুনলাম, ন্যাকা-কান্না কাঁদিস নে। এই মাসের সতেরো তারিখে ইন্দ্রর সঙ্গে তোর বিয়ে।

এরচেয়ে মাথায় বাজ পড়লেও ভালো ছিল। ইন্দ্রর সঙ্গে আমার বিয়ে। চলতি ইডিয়ম প্রয়োগ করে বলছি, ওই 'বোকা পাঁঠার' সঙ্গে। না জানে লেখাপড়া, না জানে সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতে। বাপের পয়সা ছিল, তাই ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

—মা! প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম।

—আমরা কথা দিয়েছি। আর এই বাড়িতে থেকেই তোর বিয়ে হবে। একটু চুপ করে থেকে মা বললে, তোর ভাগ্যি, তাই ইন্দ্র সব জেনেশুনেও তোকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।

এরপর আমি আর একটি কথাও বললাম না। দরকার নেই মনে করে। মনের মধ্যে তখন এমনি একটি ভাব, যা হবার হোক, নিজের জন্যে আর কোন কথা ভাববো না। আমার সব ভাবনা শেষ করে দিতে চাই।

কিন্তু ভাবনা শেষ করছি বললেই কি ভাবনা শেষ হয়ে যায়? ভাবনা ঠিকই জড়িয়ে থাকে মনে। আর ভাবতে না চেয়ে ভাবার

মধ্যে কেমন যেন একটা যন্ত্রণা জড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে যা দুঃসহ মনে হয়।

তার মধ্যে সতেরো তারিখটার জন্যে অপেক্ষাও করি। সতেরোই মাঘ। দিনটা দেখতে দেখতে এসে গেল। আর যথারীতি বিয়েও হয়ে গেল মালাবদল করে। সানাই বাজলো না, বাড়িটা আনন্দ-মুখর হলো না। শুধু একজন গ্রাম্য-পুরুত এসে মন্ত্র পড়ালো আর মা সম্প্রদান করলো আমাকে। সম্প্রদানের মুখে মায়ের চোখে জল দেখেছিলাম। যদিও মায়ের সে চোখের জল আমার মনকে স্পর্শ করেনি। আমি তখন নিজেকে যথেষ্ট শক্ত করে নিয়েছি।

মা আর ছোটকাকা ছাড়া আর কেউ ই আসেনি বাড়ি থেকে। বিয়ের পরদিন যখন ইন্দ্র নামে পুরুষটা আমাকে নিয়ে চললো, তখনো কেউ দরজা পেরিয়ে এসে দাঁড়ায়নি। তবে রওনা হবার প্রাক্কালে মা, ছোটকাকা, আর ফুলপিসিকে প্রণাম করেছিলাম আমি। সে প্রণামের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না। নিছক দায়সারা গোছের সে প্রণাম।

নবদ্বীপ শহরের কাছেই পুর্বস্থলীতে ইন্দ্রর বাড়ি। সে-বাড়িতে এলাম। নতুন বৌ আমাকে বরণ করবার জন্যে সেখানে ছোটখাটো একটু উৎসবের সূচনাও হলো। শাঁখ বাজলো, উলুধ্বনি হলো, তারপর একজন সধবা মহিলা এসে বরণও করলো। পাড়ার কিছু মেয়ে-বৌ অপেক্ষা করছিল নতুন বৌ আমাকে দেখবার জন্যে। আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তারা ভিড় করে এলো।

ভিড়ের মধ্যে কে একজন মন্তব্য করল, আমাদের ইন্দরদা তাহলে সত্যিই বিয়ে করলো।

তারপরই আমার চারদিক ঘিরে হাসির রোল উঠলো। সত্যিকার বলতে কি, আমার সেই মুহূর্তের লজ্জাটা বিস্মৃত হবার নয়।

নতুন বৌ আমি। দু-দিন না যেতে সবই বুঝতে পারলাম। আর বাস্তব অবস্থাটাও তখন আমার কাছে স্পষ্ট। ইন্দ্রজিৎ নামধারী

পুরুষটা আসলে একজন বোকা গোছের দুষ্টু চরিত্রের মানুষ। মত্তপ এবং লম্পট। আর বাড়ির আবহাওয়াটাও কেমন যেন বিষাক্ত।

বিয়ের সাতদিন গেলেই বিয়ের কনে বাপের বাড়ি যায়, আমার ভাগ্যে তা হলো না। ইন্দ্রর ঘর করতে রয়ে গেলাম পূর্বস্থলীর সেই বনেদীবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে।

এরই মধ্যে একদিন এলো ইন্দ্রর খুড়তুতো ভাই শুভেন্দু। আগেই শুনেছিলাম, শুভেন্দু এম.এ পড়ে কলকাতায় থেকে। মাঝে মাঝে বাড়ি আসে।

প্রথম দেখাতেই ভালো লাগলো। সে যখন বৌদি বলে প্রণাম করলো, তখন আমিও তাকে ঠাকুরপো বলে কাছের মানুষ হিসেবে গ্রহণ করলাম।

প্রথম দিনের আলাপেই ভালো লাগলো শুভেন্দুকে। মনে হলো, যেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। আমি ইন্দ্রর বৌ হয়েছি, কথার মধ্যেই বুঝলাম শুভেন্দু যেন তা খুশি মনে গ্রহণ করতে পারেনি। তার কথায় হাবভাবে মনে হলো, সে যেন বলতে চাইছে, বৌদি, কে তোমাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলে? কে তোমার মতো সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং সুরুচি-সম্পন্না মেয়ের এমন সর্বনাশ করলে?

তবুও যখন শুনলাম, শুভেন্দু ইংরাজিতে এম. এ পরীক্ষা দেবার জন্য মাস চারেক ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছে, তখন কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। নরকের মধ্যে মানুষের অস্তিত্ব—এটা কোনমতেই মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারলাম না।

কয়েকটা দিন গেল। ইন্দ্র সারাদিন বাইরে বাইরে কাটায়। কি জানি কিসের ব্যবসা তার। বিকেলের দিকে ফিরে আসে। সন্ধ্যে-রাতে আবার সেজে-গুজে বেরিয়ে যায়। কোথায় যায়, তা আমি জানতে চাই নি। তবে একদিন পারুল ঝিয়ের কথায় শুনেছিলাম, সে কোথায় যায়। পারুল ঝি কাকে যেন বলছিল, এখনো খেপা মাগীর নেশা কাটেনি বড়বাবুর। শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল। পরমুহূর্তে হেসেছিলাম 'বড়বাবু'

কথাটা মনে হতে। ইন্দ্র আবার বড়বাবু।

রাতে বড়বাবু রোজই মাতাল অবস্থায় ফিরতো। আমি ভালো-মন্দ কিছুই বলতাম না। আর মাতাল অবস্থায় আমাকে নিয়ে কদর্য ভাষায় খিস্তি করতো।

এক-একদিন আবার 'প্রেম' করতে আসতো আমার সঙ্গে।

একদিন রাতে বড়বাবু নিজে তো মাতাল হয়ে ফিরেছে, তারপর আমার জন্যে নিয়েও এসেছে। এসেই বললে, একটু খাও বড়বৌ—দেখবে কি মজা।

বোতলটা হাত পেতে নিয়ে সজোরে মেঝের ওপর আছড়ে ফেললাম। আর সেই মুহূর্তে উত্তেজিত বড়বাবু আমাকে সজোরে লাথি মারলো। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম কাঁচের টুকরোর ওপর। কয়েক জায়গায় কাঁচের টুকরো ফুটে রক্ত ঝরতে আরম্ভ হলো। আর তারই মধ্যে মাতাল বড়বাবু আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

চীৎকার করে উঠলাম। আর সে চীৎকারের মধ্যে বার বার শুভেন্দু ঠাকুপোর নাম করছিলাম।

বাড়ির লোকজন ছুটে এলো। তার মধ্যে শুভেন্দু এসেই ইন্দ্রকে সরিয়ে দিয়ে আমাকে তুলে ধরলো।—এসো বৌদি, আমার সঙ্গে এসো।

শুভেন্দু আমার হাত ধরে নিয়ে এলো পাশের ঘরে। সঙ্গে বাড়ির লোকজনেরাও এসেছে। তার মধ্যে আমার শাশুড়ীকেও দেখলাম।

শুভেন্দু আমার শাশুড়ীকে লক্ষ্য করে বললে, জেঠিমা, তোমরা কেন ইন্দ্রদার বিয়ে দিলে? জেনে-শুনে মেয়েটার কি সর্বনাশ করেছ বলো তো?

জেঠিমা সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত সুরে বলে উঠলেন, ও সর্বনাশী মেয়েকে ইন্দ্র ছাড়া আর কে নিত? আমি বলে জেনে-শুনে ওকে ঘরে এনেছি।

যে কথাটা হয়তো সবাই জানতো না, সে কথাটা এক-এক করে সবার কানে গিয়ে পৌঁছলো। শুভেন্দু সব শোনার পরেও কিন্তু

আগের মত বৌদি বলে আমার কাছে এসেছে। কথা বলেছে, গল্প করেছে। সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে সময় সময় আলোচনাও করেছে।

শুভেন্দু আমার কাছে আসে, আমি তার ঘরে যাই—এ নিয়ে নানা চাপা কথা আরম্ভ হলো এ বাড়িতে। একদিন তো আমার শাশুড়ী বলেই ফেললেন, দেওরের সঙ্গে অমন মেলামেশা ভালো নয় বৌমা।

কথাটা শোনার পরেও আমি কোন উত্তর দিইনি।

একদিন রাতে বড়বাবু তো আমাকে ধমক দিলো।—শুভ'র সঙ্গে তোমার অত কিসের ? আর ও ছোঁড়াও ছুটি নিয়ে বুঝি এই জন্যেই বাড়ি রইল।

বললাম, তোমরা আমাকে যা খুশি তাই বলো, কিন্তু শুভর নামে কিছু বোলো না। অমন ছেলে হয় না।

ইন্দ্রজিৎ কুৎসিত মুখভঙ্গি করে বললে, কচি পাঁঠার মাথা চিবোতে ইচ্ছে হয়েছে বুঝি সুন্দরী ?

একবার ইচ্ছে হলো হাতের সামনে যা আছে তাই ছুঁড়ে মারি তার মুখে। কিন্তু কোনমতে রাগ সামলে নিলাম। ইন্দ্রজিৎ আপন মনে আরো কি সব বলতে লাগলো। যা শোনার ইচ্ছে ছিল না।

সেই মুহূর্তে ছুটে চলে এলাম শুভ ঠাকুরপোর ঘরে। শুভ টেবিলে মাথা গুঁজে কিছু লিখছিল, পিছন থেকে 'আমাকে বাঁচাও শুভ ঠাকুরপো' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ি শুভ ঠাকুরপোর পিঠের ওপর। আর আমাব পিছু পিছু ইন্দ্র এসেছে। হাতে তার শংকর মাছের চাবুক। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিকৃত কণ্ঠে আমাকে তো কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিলেই, শুভ ঠাকুরপোকেও কথা শোনাতে ছাড়লো না।

তারপর শুভ ঠাকুরপোর সামনে আমাকে শংকর মাছের চাবুক দিয়ে আঘাত করলো ইন্দ্রজিৎ। সে আঘাত নীরবে সহ্য করলাম। এতটুকু আর্তনাদ দূরের কথা, সামান্য একটু টুঁ-শব্দও করলাম না। এমন কি চোখেও জল ঝরলো না। আমি তখন নিজেকে অন্যকিছু

ভেবে নিয়েছি। পাষাণী অহল্যার মতো না হলেও, ওইরকম একটা কিছু।

শুভ এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো ইন্দ্রজিতের ওপরে। পারবে কেন। মাতাল ইন্দ্রজিৎ, শুভকে সজোরে ধাক্কা দিতে টাল খেয়ে পড়ে গেল টেবিলের ওপর। টেবিলের কোণে লেগে শুভর কপাল কাটলো। শুভ তখন আমার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলো, বৌদি তুমি চলে যাও এ বাড়ি ছেড়ে। এখানে থাকলে হয় তোমাকে আত্মহত্যা করতে হবে, না হয় পাগল হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি আত্মহত্যা করিনি, পাগলও হয়নি। এখনো বেঁচে আছি। কেমন আছি, তা আর নতুন করে, নাই বা বললাম। আছি এই পর্যন্ত।

যে আমাকে আত্মহত্যার কথা শুনিয়েছিল, সেই শুভ ঠাকুরপো আত্মহত্যা করলো। তার মৃতদেহ আমি দেখেছিলাম। বীভৎস সে দৃশ্য। কড়িকাঠে ঝুলছিল দেহটা। দেখে আঁতকে উঠেছিলাম। চাপা আর্তনাদ করে উঠেছিলাম। তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলাম।

আমারই জন্যে শুভ মরলো। তার মৃত্যুর পরেও ক'দিন ছিলাম ইন্দ্রজিতের বাড়িতে। এই জন্যেই ছিলাম, পালাবার পথ পাচ্ছিলাম না বলে।

সারাদিন আমাকে চোখে চোখে রাখতো বাড়ির লোকেরা। রাত্রে বাইরে যাবার সব দরজা তালা-বন্ধ থাকতো। চাবি থাকতো শাশুড়ীর আঁচলে। সুতরাং দরজা খুলে পালিয়ে যাবার উপায় ছিল না।

শেষটা মনে মনে ঠিক করলাম, অভিনয় করবো। সাধ্বীস্ত্রীর অভিনয়। পতি পরম দেবতা ছাড়া যে আর কিছু জানে না। তাছাড়া শাশুড়ীকেও সাক্ষাৎ দেবী জ্ঞানে ভক্তি করতে আরম্ভ করলাম।

অভিনয়ে কাজ হলো। ইন্দ্র ভাবল, আমি সত্যই তাকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছি। শাশুড়ী ভাবলো, এবারে ঘরে আমার মন বসেছে।

সুতরাং পাঁচিলের দরজায় চাবি দেওয়া বন্ধ হলো। আমিও সময় আর সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আর একদিন সে সুযোগ এসেও গেল। পালিয়ে এলাম ইন্দ্রর ঘর ছেড়ে। আসার সময় কিছু সংগ্রহ করে নিতেও ভুলিনি। নিজের গয়নাগাঁটি তো ছিলই, সেই সঙ্গে ইন্দ্রর আলমারির চাবি খুলে নগদ হাজার দেড়েক টাকাও নিলাম।

ভয় যে পাইনি এমন নয়, তবু সে ভয়কে সহজেই উপেক্ষা করলাম। কতকটা 'আগুনে দিয়েছি ঝাঁপ, মরণে কি ভয়'-এর মতো।

সেই রাতের অন্ধকারে আমি স্বচ্ছন্দে পালিয়ে এলাম পূর্বস্থলী ছেড়ে।

কলকাতায় এসেই প্রথম মনে হলো, পালিয়ে তো এলাম, এখন কোথায় যাবো? মনে পড়লো, রাকাদি, রেবা সোম আর সুদর্শনাদির কথা। কিন্তু পরিচিত কারো কাছে যাওয়াটা ঠিক হবে না ভেবে সেদিনের মতো একটা হোটেলে এসে উঠলাম।

শিয়ালদার কাছে আধা-অভিজাত হোটেল। ছোট্ট একটি একক শয্যার ঘরও পেলাম। যদিও হোটেলের ম্যানেজারের ভ্রু কুঁচকে গিয়েছিল যখন প্রথম নাম-ঠিকানা লেখালাম হোটেলের খাতায়।

আমার সিঁথিতে তখনো জ্বলজ্বল করছিল সিঁদুরের টিপ। হাতের শাঁখা আর সোনা-বাঁধানো লোহাও আমার দুহাতে সধবা নারীর সার্টিফিকেট হয়ে শোভা পাচ্ছিল। কিন্তু আমি জানতাম, এই সিঁদুর, শাঁখা আর লোহার চেয়ে মিথ্যে আর কিছু নেই। অথচ আপাতত এই মিথ্যেটাকে বজায় রাখতে হবে।

দিন আট-দশ হোটেলে রইলাম। এ ক'দিন শুধু ভেবেছি নিজেকে নিয়ে। কি করবো, কোথায় যাবো। কিন্তু ভেবে একটি সহজ পথও খুঁজে পাইনি।

আবার এটাও বুঝলাম, হোটেলে আর বেশী দিন থাকা ঠিক হবে না। ক'দিনে আমাকে নিয়ে কানাঘুষো শুরু হয়েছে তা বুঝতে

পারছি। অনেক কৌতূহলী চোখ আমাকে লক্ষ্য করে, তাও দেখেছি। বিশেষ করে হোটেল ম্যানেজারটিকে দেখে মনে হয়, আমাকে সে রীতিমত সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং এবারে হোটেল আমাকে ছাড়তে হবে।

কিন্তু কোথায় যাবো, কি করবো, এই নিয়ে কত চিন্তা, অথচ যেদিন এলাম গৌরীশঙ্কর দে লেনের ঠিকানায়, সেদিন কত সহজেই এসে পৌঁছলাম। কিন্তু কেমন করে এলাম, সে কথাটা নাই-বা বললাম। যেমন করে আরো মেয়েরা এখানে এসেছে আমিও ঠিক তেমনি করেই এসেছি।

প্রথম প্রথম এই নিষিদ্ধ গলির ঠিকানায় এসে ঘরের বাইরে আসতে পারিনি। কেবলই মনে হতো এ আমি কি করলাম! এর চেয়ে মরাই ভালো ছিল।

কিন্তু মরার চেয়ে জীবনটাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচা আমার কাছে সহজ। আর তা যে ভাবেই হোক না কেন।

কি জানি কেন, বাঁচার কড়ি সংগ্রহ করতে দরজায় দাঁড়াতে আমার আপত্তি।

তবু শেষ পর্যন্ত একদিন নিষিদ্ধ গলির দোতলা বাড়ির নিজের ঘরটির দরজায় এসে দাঁড়ালাম আমার অ-কুমারী দেহটাকে পসরা করে।

প্রথমটা সংকোচে, জড়তা—তারপর প্রচণ্ড আত্ম-অভিমান। কিছুতেই পারলাম না দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে। চলে এলাম ঘরে। পরিপাটি শয্যার ওপর লুটিয়ে পড়লাম। কান্নার উত্তাল তরঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলাম।

এখানেও সান্ত্বনার স্পর্শ। ফিরে তাকালাম। সুন্দর সুবেশ এক যুবক আমার মাথায় চুলের ওপর হাত রেখেছে। চিনি না, জানি না ও কে। অথচ কত পরিচিতের মতো আমার মাথার কাছে এসে বসেছে।

দু চোখে বিস্ময় নিয়ে ফিরে তাকিয়েছিলাম। হয়তো বলতে

চেয়েছিলাম, তুমি কে ? আমার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছ কেন ?

কিন্তু তার আগেই কথা শুনতে পেলাম। সে বলছে, এ বাড়িতে কেউ কান্নার দাম দেবে না—এখানে কাঁদতে নেই।

চমকে উঠেছিলাম কথা শুনে। তারপর আবার বলেছিল সে, চোখের জল মুছে ফেল সুন্দরী।

এতক্ষণে উঠে বসলাম। ফিরে তাকালাম সন্ধ্যার অতিথির মুখের দিকে। কিছু বলতে গেলাম। কিন্তু পারলাম না। আমার দু চোখে তখনো বিস্ময় জড়ানো।

—আমাকে তুমি চিনবে না। আমার নাম কুমার চৌধুরী। আর পরিচয়—বলে হাসলো কুমার চৌধুরী।

তারপরই কথা শেষ করলো সে—এখানে সবার পরিচয় এক। জীবনে চরম মূল্য দিয়ে আনন্দের বিকিকিনি করতে আসা। কিন্তু আনন্দ এখানে দুর্লভ, দুঃখ পাওয়াটাই সহজ। তবে কি জানো, এখানকার জৈবিক উল্লাসে সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা এক হয়ে যায়।

আমার দৃষ্টি তখনো কুমার চৌধুরীর মুখের দিকে। আর সেই দেখার মুহূর্তে ভেবেছিলাম, কুমার চৌধুরী হয়তো আমার মতো ভাগ্যতাড়িত কেউ।

কত সহজে কুমার চৌধুরী আমার কাছে এসেছিল। আবার কত সহজে চলে গেল। যেদিন ও এসেছিল, সেদিন আমার মনের অঙ্গনে আনন্দের সানাই বাজেনি। কিন্তু আজ যখন ও চলে গেছে, তখন মনটা আমার অব্যক্ত ব্যথায় সিক্ত হলো।

চিন্তার বৃত্তের মধ্যে আমি অনেক পেছিয়ে পড়েছিলাম। আবার ফিরে এলাম বর্তমানের মুহূর্তে।

দক্ষিণের বারান্দায় বসে আছি। সামনে সমুদ্র। অবিরাম উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে। সঙ্গীতের মতো সে উচ্ছ্বাস। কিন্তু আমি —যে আমি সমুদ্র দেখলেই অস্থির হয়ে উঠতাম, সে আজ আশ্চর্য রকমের স্থির। জড়ের মত। কিন্তু কেন ? তবে কি নতুন করে

জীবনের কোন ক্রান্তি-লগ্নে এসে থেমেছি ? হয়তো হবে। হয়তো আবার নতুন কোন জীবনের চৌহদ্দিতে গিয়ে পৌঁছবো। কিংবা মালা বিশ্বাস নামে যে মেয়েটা এতদিন নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, এবারে সে হয়তো একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

চিন্তায় ছেদ পড়ল কলিংবেলটা কর্কশ সুরে বেজে উঠতে। দরজা খোলাই ছিল, কিন্তু ঘর অন্ধকার। উঠে ভিতরে গেলাম। আলো জ্বাললাম। হোটেলের বয় এসে দাঁড়িয়েছে।

– কি রে, কিছু বলবি ?

না। কিছুই বলতে আসে নি সে। আমার খবর নিতে এসেছে। যাবার আগে সাহেব, অর্থাৎ কুমার চৌধুরী ওর হাতে বকশিশ দিয়ে বলে গেছে মেমসাহেবকে একটু দেখাশোনা করতে।

কোন দরকার নেই শুনে ছেলেটি চলে গেল। আবার ফিরে এলাম দক্ষিণের বারান্দায়।

বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়লাম সামনের দিকে। আর সেই মুহূর্তে মনে হলো, আমি যদি এই বারান্দা থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ি, কেমন হয় !

হয়তো পড়ে গিয়ে আহত হবো, কিংবা একেবারে শেষ হয়ে যাবো।

না না. আমি মরতে চাই না। পৃথিবীর আলো-বাতাসের অংশীদার হয়ে বাঁচতে চাই।

হঠাৎ দৃষ্টি গেল দূরে। একজন নিঃসঙ্গ পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে ল্যাম্পপোস্টের নিচে। কাল যাকে দেখেছিলাম, সে-ই।

অতনু পাকড়াশী। নামটা কাল কিছুতেই মনে করতে পারিনি। অথচ আজ না ভাবতেই মনে পড়লো।

কিন্তু সত্যিই কি ও অতনু ? না আর কেউ। অতনুর মতো দেখতে। আর অতনু যদিও হয়, তাতে আমার কি হবে ? তার কাছে যদি যাই, পুরনো পরিচয়ের দাবি নিয়ে বলি, আমি তোমার সেদিনের নীরব ভালোবাসার মূল্য দিতে এসেছি অতনু, তাহলে সে দাম নিয়ে তার ভালোবাসা আমাকে দেবে।

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। ফিরে তাকালাম ল্যাম্পপোস্টের দিকে। যে দাঁড়িয়ে ছিল, সে নেই। চলে গেছে সেখান থেকে।

তখনো আমার মনের মধ্যে স্থিরবিন্দুতে দাঁড়িয়ে অতনু পাকড়াশী। কলেজের ছাত্র-বন্ধুদের মধ্যে তার মনটা ছিল নানা ঐশ্বর্যে ভরা– সে আমায় ভালোবাসতে চেয়েছিল, সেই তো আমার গৌরব।

অতনুর কথা ভাবতে আমার চোখ দিয়ে জল ঝরলো। যে আমি চোখের জল ফেলছি, সে আমি আর-এক মালা বিশ্বাস। যার ঠিকানা ছিল মাধুকরী গ্রাম, যে কলকাতায় পড়তে এসেছিল।

গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে ঘরে এলাম। মাধুকরী গ্রামের সে মেয়ের অস্তিত্ব কোথায়? আজকের আমার মধ্যে? যার চিবুকে কামার্ত পুরুষের হিংস্র চুম্বনের স্বাক্ষর।

এর পরেও ক'দিন পুরীতে ছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি হোটেলের নির্দিষ্ট কক্ষে বন্দী করে রেখেছিলাম নিজেকে। একটা দিনের জন্যেও বাইরে যাইনি। যেতে চাইনি।

একবার মনে হয়েছিল, দেখি না সাগরবেলায় যদি অতনুকে খুঁজে পাই। কিন্তু তারপরই ভেবেছিলাম, না থাক—অতনু আমার জীবনে স্বপ্নের মধ্যে সত্যি হয়ে যাক। তার ভালোবাসার দাম আমি দিতে পারিনি সেদিন, কিন্তু আজ যদি সে আমাকে ঘৃণা করে? তাহলে আমার জীবনের সুন্দরের স্বপ্নটাও নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে।

অথচ যখন পুরী এক্সপ্রেসের কামরায় পাশের সহযাত্রী হিসেবে অতনুকে দেখলাম, তখন সব জিনিসটা কত সহজ হয়ে গেল। আমি তাকে দেখে চমকে ওঠার অবসর পাইনি, তার আগেই অতনুর সহজ আহ্বান, আরে মালা না? কী আশ্চর্য!

আমি সত্যি একটু অসহায় বোধ করছিলাম। কিন্তু অতনু তখনো বলে চলেছে, সত্যি, আজ আমার অবাক হবার পালা— তোমার সঙ্গে যে হঠাৎ এভাবে দেখা হয়ে যাবে, এ আমি ভাবতেও পারিনি। তারপর মালা, বলো কি করছো এখন! পড়াশুনো,

মাস্টারী, না অন্য কিছু ?

অতনু আমাকে পেয়ে বড্ড বেশী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। হয়তো ওর পক্ষে তা সম্ভব। আমি কিন্তু তার উচ্ছ্বাসের সামিল হতে পারলাম না। বরং কেমন যেন সংকুচিত হয়ে পড়লাম। অতনু আমার জীবনের কতটুকু জানে ? কিছুই জানে না। যদি জানতো তাহলে আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখে অবজ্ঞার ছায়াটা স্পষ্ট হতো। হয়তো আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অপরিচিতের মতো বসে থাকতো।

অতনুর মুখোমুখি বসেও আমি যেন অনেক দূরে। আর আমার মন থেকে হঠাৎ পাওয়ার আনন্দটা হারিয়ে গেছে। একটা ব্যথার উপলব্ধিই তখন আমার দেহ মন জুড়ে। আমার মুখের রেখাতেও হয়তো তা স্পষ্ট হয়ে ফুটেছিল। যা অতনুর চোখকে এড়িয়ে যায়নি।

অতনুর এবারের কথায় এতটুকু উচ্ছ্বাসের স্পর্শ নেই। জিজ্ঞাসা করলে, তারপর, কেমন আছো মালা ?

আমি নিজেকে সহজ করে নিতে চেষ্টা করেছি। বললাম, ভালো নয়।

বলতে চেয়েছিলাম ভালো আছি। কিন্তু বলে ফেললাম তার উল্টোটাই। আর বলার পরেই কথাটা ফিরিয়ে নিতে চাইলাম—না, ঠিক ভালো নয়, তা বলছি না, তবে যেমন থাকতে ইচ্ছে, তেমন কি থাকা যায় ?

অতনু বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালো। আমিও তার দৃষ্টির সামনে সহজ মেয়ের মত বসে থাকতে চেষ্টা করলাম।

এবারে মৃদু হাসলো অতনু। বললে, তোমাকে বুঝতে পারছি না মালা। যাক, চলো—ট্রেন ছাড়তে তো দেরি আছে মিনিট পনেরো—একটু চা খেয়ে আসা যাক।

অতনুর সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে নেমে এলাম। চা-ওয়ালার কাছ থেকে দু' ভাঁড় চা নিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই পান করলাম। চা পানান্তে একটি সিগারেট ধরালো অতনু। বললে, তোমাকে বড্ড বেশী

ক্লান্ত দেখাচ্ছে মালা। কেন বলো তো?

—অনেক ছুটেছি, তাই এমন মনে হচ্ছে।

অতনু হাসলো।

আমি এবারে বললাম, তুমি তো এত সময় আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চেয়েছো, উত্তর আমি দিতে পারিনি, এবারে তোমার কথা বল তো?

—আমার কথা? অতনু সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, আমি যা ছিলাম তাই আছি মালা।

অতনুর কথা শুনে অবাক হলাম। কত সহজে সে নিজের কথা বললে। কয়েকটি ছোট শব্দে একটি মাত্র বাক্য - তারই মধ্যে ওর সব কথা শেষ করলো।

—কি ভাবছো? অতনু জিজ্ঞাসা করলো।

—তোমার কথা।

—আমার কথা এর আগে কোনদিন ভেবেছ?

—জানো অতনু, আমার অতীতে যদি সত্যি কিছু থাকে, আর যে সত্যিকে আজও অস্বীকার করি না, তা হলো তোমার ভালোবাসা। তোমার কি মনে আছে, তুমি আমাকে ভালোবেসেছিলে? যার দাম আমি দিতে পারি নি।

—মনে সবই আছে মালা। আমার অতীতের মনটা এখনো তো ফসিল হয়ে যায়নি। যাক গে ওসব পুরনো কথ'—কথার মধ্যে হয়তো অতনুর নজর পড়েছে আমার চিবুকের ক্ষতচিহ্নের ওপর। যে চিহ্নটা এখনো পুরনো হয় নি। বরং এক জায়গায় শুকনো রক্তের মামড়ি রয়েছে। যদিও খানিকটা জায়গার মামড়ি আজই স্নান করবার সময় উঠে গেছে। সে জায়গাটা কতকটা ত্রিভুজের মত সাদা। আমার চিবুকের ক্ষতচিহ্ন দেখে অতনু জানতে চাইলো, আমি পড়ে গিয়েছিলাম কিনা। উত্তর দিতে একটু সময় লাগলো বৈকি; বললাম, সমুদ্রের সঙ্গে কি ছেলেমানুষী করা যায়—তাই করতে গিয়েছিলাম—; তারপর যা হবার তাই হলো—ভাঙা শামুক

বিঁধল চিবুকে, আর—সে লজ্জার কথা নাই-বা শুনলে।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরী এক্সপ্রেসের গার্ডের বাঁশী বাজলো। যে সব যাত্রী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল, তারা উঠে গেল কামরায়। সেই সঙ্গে আমরাও।

ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে অতনু বললে, আজ সারারাত এমনি করে বসে থাকতে পারবে তো? কতদিন পর দেখা হলো, আবার হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যে যার জগতে হারিয়ে যাবো, হয়তো দশ-বিশ বছর বাদে আবার কোথাও এমনি আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যাবে, কিংবা কখনো আর দেখা হবে না—

কথা শেষ করতে দিলাম না অতনুকে। বললাম, কেন দেখা হবে না অতনু?

অতনুর কণ্ঠেও জিজ্ঞাসা, এত দিন কেন দেখা হয়নি মালা?

—এ প্রশ্নের উত্তর কি তুমি দিতে পারো অতনু?

—পারি।

অতনু হাসতে লাগলো। তার হাসিটা আমার কাছে এখন রহস্যময় মনে হচ্ছে। তবে কি ও জানে আমার এতদিনের দিন-যাপনের কথা? না, না -নিশ্চয়ই তা জানে না জানলে আমাকে ও ঘৃণা করতো। অন্তত মুখের কথাতেও না হলে মুখের রেখায় তা প্রকাশ পেত।

ট্রেনের গতি আগের চেয়ে দ্রুত হয়েছে। কিন্তু আাম সেই গতির সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছি না। এক বিন্দুতে স্থিব হয়ে আছি।

—জানো, বছর তিনেক আগে একটা কবি-সম্মেলনে যোগ দিতে তমলুকে গিয়েছিলাম—তোমার ঠিকানা না জানলেও, জানতাম তোমার বাড়ি তমলুক। আর বাড়ি খুঁজে নিতেও অসুবিধে হয়নি। অথচ আশ্চর্য কি জানো, মালা নামে মেয়েটার কথা তোমার বাবা, মা, কিংবা কাকা-কাকিমা কেউ বলেন নি। শুধু তোমার ছোটভাই আমার পিছু পিছু বেশ কিছু দূর এসে বলেছিল, জানেন, আমাদের দিদি হারিয়ে গেছে। আরো বলেছিল, আমি যদি সেই হারিয়ে যাওয়া দিদির দেখা পাই, তা হলে যেন তার কথা বলি।

আমার জীবনে এমন দুঃসহ মুহূর্ত বোধহয় আগে আর কখনো আসেনি। কাঁদবো, কি হাসবো, কি পাগলের মতো মাথার চুল ছিঁড়ে চীৎকার করবো, কিছুই বুঝতে পারছি না। ট্রেনের কামরায় আরো যাত্রীর মধ্যে এমন কিছু বলতে কিংবা করতে পারি না—যাতে আমি আর অতনু দুইজনেই ছোট হয়ে যাই। তবু মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা উত্তেজনা চেপে রাখতে আমাকে রীতিমত লড়াই করতে হলো মনের সঙ্গে।

অতনুও যেন আমাকে সুযোগ দিলে এই উত্তেজনা কাটিয়ে ওঠার। মনে হলো, কতকটা ইচ্ছে করেই সে জানালার বাইরে দৃষ্টিপাত করে আমাকে নিশ্চিন্ত করতে চাইলো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে একটা দুষ্ট নারী মাথা-চাড়া দিয়ে উঠলো। নিষিদ্ধ গলির নায়িকা আমি—কত পুরুষকে ক্ষতবিক্ষত করেছি কটাক্ষপাতে, আর অতনুর মতো কোমলচিত্ত কবিকে জয় করতে পারবো না? একটা শিকারের নেশা মুহূর্তে আমাকে পেয়ে বসলো। নিজেকে প্রস্তুত করলাম। অতনুর দেহ-সান্নিধ্যে নিবিড় হতে চাইলাম। কিন্তু তার আগেই যেন অতনুর জাগ্রত দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেলাম আমি। অতনু আমার চোখে চোখ রেখে বললে, তোমার ছোটভাই সেদিন যদি বুঝতো তার দিদির হারিয়ে যাবার বয়েস নেই, তা হলে সে আমাকেও কথা বলতে পারতো না। আমি তারপর থেকে প্রায়ই তোমার কথা ভাবি। আর যখনই ভেবেছি, তখনই মনে হয়েছে, মালা নামে সেদিনের সেই উচ্ছল তরুণীটি কোনদিনই জীবন কি তা বুঝলো না, বুঝতে চেষ্টা করলো না। আর সত্যি বলতে কি, আমি আজ তোমাকে দেখার পরেও সেই কথাটা ভাবছি।

কথা শেষ করার পরেও অতনু মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি তার দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টি বেশীক্ষণ মিলিয়ে রাখতে পারলাম না। দৃষ্টি নত হলো আমার। নতদৃষ্টি অশ্রুতে রুদ্ধ হলো। অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়লো শাড়ির ওপর। চোখের জলেও শাড়ি ভিজে যায়—তাও দেখলাম।

—নাই বা কাঁদলে মালা। অতনুর কণ্ঠে সমবেদনার স্পর্শ।

যদিও আমার ব্যথার অংশ নেবার কোন কারণ দেখছি না—তবু যখন চোখের জল মুছে অতনুর মুখের দিকে তাকালাম, তখন ওকে ব্যথিত মনে হলো।

সুপ্ত অভিমান মাথা-চাড়া দিয়ে উঠলো। অভিমান বড় দুর্বল করে দেয়। আমিও প্রচণ্ড অভিমানে সঙ্গতি হারিয়ে ফেললাম। ট্রেনের কামরায় এত লোকজন, তারই মধ্যে অতনুর হাত ধরে কতকটা চীৎকার করে বলে উঠলাম, তুমি সব জেনেও আমার সঙ্গে অভিনয় করছো কেন অতনু? তুমি তো অনায়াসে আমাকে ঘৃণা করতে পারতে—

অতনু মৃদু তিরস্কার করে বললে, কি ছেলেমানুষী করছো মালা —চুপ করো। তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে পরে, এখন নয়।

আমি বললাম, আর তো দেখা নাও হতে পারে।

অতনু বললে, তা হলে তো সব চুকেই গেল। আর আজকের আমাদের কাছে পথের রাতটা যখন এসেছে, তখন দুজনে হাসি-খুশিতে ভরিয়ে নিই না কেন।

খানিকসময় চুপ করে বসে রইলাম। তারপর বললাম, তুমি কবি—তোমার কাছে যা সহজ, আমার কাছে তা নাও হতে পারে।

অতনু অন্যদিকে মুখ ফেরালো। নাম ধরে ডাকলাম, তবু ফিরে তাকালো না। এক দুঃসহ নীরবতার মধ্যে দুজনে পাশাপাশি বসে রইলাম।

ট্রেন ইতিমধ্যে খুরদা রোড জংশনে এসে দাঁড়াতে হঠাৎ-ই মনে হলো, আমি যদি অন্য কামরায় চলে যাই, কেমন হয়।

সুটকেশটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াই। অতনু দেখলো, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করলো না। 'কোথায় যাচ্ছো' একথাটা তো বলতে পারতো। তারপর নাই-বা আমাকে আর বসতে বলতো।

আমিও তো বলতে পারতাম, আমি অন্য কামরায় যাচ্ছি অতনু। তা-ও তো বলতে পারলাম না। সুটকেশটা হাতে নিয়ে নেমে

এলাম প্ল্যাটফর্মে, অতনুর সামনে দিয়ে চলে এলাম, ফিরে দেখার পরেও আমাকে একবার 'মালা' বলে ডাকলো না সে। আমি পিছন ফিরে লক্ষ্য করলাম, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে আমাকেই দেখছে।

লেডিজ কম্পার্টমেণ্টে জায়গা পেয়ে সেখানেই উঠে বসলাম। কিন্তু মনের মধ্যে তীব্র অস্বস্তির কাঁটা বিঁধে রইলো। বার বার ভাবলাম, কেন অতনুর কাছ থেকে পালিয়ে এলাম। জীবনের নিতান্ত দুঃসময়ে মনে মনে তাকেই তো চেয়েছিলাম। এবং তাকে কাছে পেয়েও নিজেকে তার কাছে পৌঁছে দিতে পারতাম। আরো একবার নিজের কাছে মালা বিশ্বাস পরাজিত হলো।

প্রায় সারারাত কামরার কোণে জেগে বসে রইলাম। শেষ-রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙে গেল খড়গ্‌পুরে পৌঁছতে।

উঠে বসলাম। চা-ওয়ালার কাছ থেকে এক পাত্র চা নিলাম। চা পানে যদি জড়তাটা কেটে যায়। ইচ্ছে হলো, প্ল্যাটফর্মে নেমে খানিক পায়চারি করি। আবার অতনুকে দেখে আসার ইচ্ছেও হলো।

কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হলো, না থাক। অতনুকে দেখে কি করবো। তার কাছ থেকে সামান্য সহানুভূতি ছাড়া আর কি আমার পাওনা থাকতে পারে? অতীতের ভালোবাসার দাবী নিয়ে তো তার কাছে কিছু চাওয়ার নেই। হয়তো অতনু এতদিনে ছোট একটি সংসার রচনা করেছে। আর যদি নাও করে থাকে, তাহলেও সে তো আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে না, এসো মালা—তোমাকে নিয়ে আমি সম্পূর্ণ হই।

অতনুর কথা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কিছু ভাবতে চেষ্টা করলাম। নিষিদ্ধ গলির মেয়েরা কি করছে এখন? রাত শেষ হয়ে এসেছে— নিশ্চয় চিরাচরিত নিয়মে তারা অবসন্ন দেহটাকে এখনো সবাই অবিন্যস্ত শয্যার ওপর এলিয়ে রেখেছে। এলার দেহের ক্ষুধা সহজে মেটে না, সে হয়তো তার মাড়োয়ারী ছোকরাটাকে আবার

কাতুকুতু দিয়ে উত্তপ্ত করতে চাইছে। এলাটা যেন কি। ওকে আমি কতবার বরেছি, এলা এমন করিস নে, মরে যাবি। আর ওই ভোঁতকা ছোঁড়াটাকে এমন করে নিংড়ে নিসনে। কিন্তু এলা কি কথা শোনবার মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে যা তাই বলে বসবে। নোংরা কথাগুলো ওরা কত স্বচ্ছন্দে বলে। কিছু বলতে গেলেই বলবে, নোংরা কাজ করছি, দিন রাত নরক ঘাঁটছি, আর নোংরা কথা বললেই দোষ?

যুক্তি বিচারে মিথ্যে বলে না এলা কিংবা আর আর মেয়েরা। সব শালীনতা বিসর্জন দিয়ে বাইরের পালিশটা বজায় রাখার মানে, নিজেকে ফাঁকি দিয়ে চলা। আর আমি তাই করি বলেই, নিষিদ্ধ গলির মেয়েরা সামনে পিছনে হাসাহাসি করে।

আমিও কোনদিন নিজেকে তাদের বাইরে যদিও ভাবিনি, তবু একটা কথা জোর করেই মনের মধ্যে পুষে রাখতাম, আমি ওদের মত হলেও লেখাপড়া জানি। বাংলার মত ইংরেজীও অনর্গল বলতে পারি। ওরা সময় পেলে দল বেঁধে সিনেমায় যায় হিন্দী ছবি দেখতে, কখনো কখনো ঠাকুর-দেবতার বাংলা ছবিও দেখে। আমি এলা-রীতাদের সঙ্গে একবার ছাড়া দুবার যাইনি। যখন গিয়েছি একাই গিয়েছি। হয় পরিচ্ছন্ন বাংলা ছবি, না হয় ইংরেজী ছবি দেখতে। নিষিদ্ধ গলির সব মেয়ের চলন-বলন বলে দেয় সে রূপোপজিবীনি—ঘরেও যা বাইরেও তাই। আমি কিন্তু সে ভাবে চলি না। চেষ্টা করি সাধারণ মেয়ের মত চলাফেরা করতে।

(তবু কি অতনুর চোখে আমি ধরা পড়ে গিয়েছি? অতনু কি বুঝতে পেরেছে তার একদা বান্ধবী আজ কলকাতার নিষিদ্ধ গলির রূপোপজিবীনি?)

হঠাৎ মনে হলো ট্রেনের গতি কিছুটা মন্থর হয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। রূপনারায়ণের সেতু সামনে। মনটা খুশীতে ভরে গেল। আমার চেনা-জানা রূপনারায়ণ। কত সময় কারণে-অকারণে এখানে বেড়াতে এসেছি। কত সময় এখান

থেকে স্টীমার চেপে বেড়াতে গিয়েছি। কাকিমার ছোটবোনের বাড়ি কোলাঘাটে। স্টেশন থেকে বাড়ি দেখা যায়।

রূপনারায়ণ ব্রীজ পেরিয়েই কোলাঘাট স্টেশন। চলতি গাড়ি থেকে কাকিমার বোনের বাড়ি দেখলাম। কে যেন ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে ভিজে শাড়ি শুকোতে দিচ্ছে, তাও চোখে পড়লো।

মনে পড়লো পুরনো কথা। রূপনারায়ণ নদী, মাধুকরী গ্রাম, কলঙ্কী ঝিল—তারপর আরো কত সত্যি ছবি মুহূর্তে প্রতিফলিত হলো মনের পর্দায। যে ছবির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মালা নামে একটি মেয়ে।

আমার মন ব্যথায় সিক্ত হলো। দুচোখও জলে ভরে উঠলো কখন। তারপর বর্তমানের মুহূর্তে নিজেকে ফিরিয়ে এনে ভাবলাম, কলকাতায গিয়ে এবারে কি করবো? আবার কি কুমার চৌধুরীর পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো? আর সে যদি না আসে, তাহলে কি আবার নতুন কোন দেহলোভী পুরুষের অপেক্ষায় ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবো?

রীতা, এলা—তারা কি ভাববে, যদি কুমার চৌধুরী না আসে? যাই ভাবুক, নিশ্চয় তারা খুশী হবে আমার দুর্ভাগ্যে। কুমার চৌধুরীর মত শাঁসালো খদ্দের আমার ঘরে বাঁধা থাকতো—এ নিয়ে তো রীতা এলারা কম কথা বলে নি। এমন কি কুমারকে ভাঙিয়ে নিতেও তারা চেষ্টা করেছে। তবুও কুমার আমার ছিল।

কুমার চৌধুরীর কামনা-নিশ্বাসে অহরহ জর্জরিত হয়েছি, শেষ পর্যন্ত সে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, যে চিহ্ন এখনো আমার চিবুকে স্পষ্ট, আর তার পরেও যে আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে—আশ্চর্য তবু আমি আজ তার কথা ভাবছি।

আমি কি কুমার চৌধুরীকে ভালোবেসেছিলাম! এ প্রশ্নটা শুধু আজই নয়, এর আগেও কয়েকবার আমার মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্নের সঙ্গেই প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে। উত্তর পাইনি। নিষিদ্ধ গলির দেহ-পসারিনীদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে 'ভালোবাসা' খুঁজতে চাওয়া আলেয়ার পিছে ঘুরে মরার সামিল।

তবু মনে হচ্ছে, কুমার কখন যেন আমার মনকে স্পর্শ করেছে। আর তার সে স্পর্শে আমি যেন সুখ পেয়েছি। শান্তি নয়, সুখ।

কুমার পুরী থেকে ফিরে নিশ্চয়ই তার নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছেছে। তার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আমি ঢুকিনি, তবে একদিন রাতে সিনেমা থেকে ফিরবার পথে গাড়ি থেকে মানিকতলা স্ট্রীটের মুখে তার বাড়িটা আমাকে দেখিয়ে বলেছিল, ওই আমার বাড়ি। কিন্তু বাড়িটার কাছে যায়নি। এমন কি পরিচিত পল্লীর পথে চলতে নিজের মুখটাকে আমার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল অদ্ভুত ভাবে।

বলেছিলাম, এত লজ্জা কেন?

বলেছিল, লজ্জা নয়, ভয়—

হেসেছিলাম কুমারের কথায়। কুমারের মত বলিষ্ঠ পুরুষও তাহলে ভয় পায়।

সেই পুরনো হাসিটা আবার ফিরে এলো আমার ঠোঁটের ডগায়।

মৃদু শব্দ করে হেসে উঠলাম। আর সেই হাসিটা স্পষ্ট হয়ে আমার কানে বাজতেই সচকিত হলাম। দৃষ্টিপাত করলাম বাইরে। কলকাতার কাছে পৌঁছেছি। হাওড়া শহরতলী দেখছি পথের দুপাশে।

আর সময় নেই, বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে সামান্য জল দিয়ে শাড়ির আঁচলে মুখটা বেশ ঘষে ঘষে মুছে নিলাম। তারপর ব্যাগ থেকে চিরুনি বার করে কপালের ওপরকার এলোমেলো চুলগুলো পরিপাটি করে নিয়ে জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখে বসে রইলাম হাওড়া স্টেশনে পৌঁছনোর অপেক্ষায়।

এত চেষ্টা করেও অতনুকে এড়াতে পারলাম না। ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছি, এদিক-ওদিক দেখছি অতনু আসছে কিনা—আর অতনুই আমাকে চমকে দিল পিছন থেকে নাম ধরে ডেকে।

—তুমি কোথায় যাবে অতনু?

অতনুর মুখে হাসি ফুটল। বললে, যেখানেই যাই না, তোমাকে পৌঁছে না দিয়ে যাবো না।

—না, না, তার কোন দরকার নেই। আমি একা যেতে পারবো।

—তুমি একা যেতে পারবে তা জানি, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে খানিক সময় কথা বলার ইচ্ছেটাকে এড়াতে পারছি না।

ট্যাক্সি এসে গেল। আমি আর কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে এসে উঠলাম। ট্যাক্সি ছাড়ার মুখে অতনুও দরজা খুলে আমার পাশটিতে বসলো। আমি কটমটিয়ে তাকালাম অতনুর দিকে। কিন্তু আশ্চর্য, অতনু তখনো হাসছে।

আমি বিরক্তি মিশিয়ে বললাম, তোমার ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হচ্ছি অতনু।

অতনু কতকটা নির্লিপ্ত ভাবে সিগারেট ধরালো। বললে, ড্রাইভারকে বল কোথায় যাবে।

—সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ, গিরিশপার্কের কাছে।

ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করলো। অতনু বললে, হিসেবে তুমি ভুল করেছ মালা—

—কিসের হিসেব, কিসের ভুল?

—সেটা আমার চেয়ে তুমিই ভালো বুঝবে। অতনু আরো নিবিড় হয়ে বসলো আমার পাশে। বললো, মালা—আমার কাছ থেকে তুমি সহজেই পালিয়ে যেতে পারতে, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে থাকা যায় না।

আমি নীরব। অতনুও আর কোন কথা বললে না। চুপচাপ বসে থেকে নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে সিগারেট টানতে লাগলো। আর আমার মনে তখন একটাই চিন্তা, কি করে অতনুকে ফিরিয়ে দেয়া যায়।

আবার একথাও ভাবছি, অতনু যদি শেষ পর্যন্ত আমার ঠিকানায় গিয়ে পেঁৗছয়, তা হলে? আমি কি করবো তখন? হয়তো খুব কাঁদবো, না-হয় পাগলের মত চীৎকার করে বলবো, আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম অতনু, কিন্তু বাঁচতে পারিনি। কিংবা অতনুকে অপমান করবো। বলবো, তুমি চলে যাও অতনু। আর কখনো আমার কাছে এসো না।

আর আমার চিন্তার এই মুহূর্তে, অতনু যখন বললে, আমার এখন কি মনে হচ্ছে জানো মালা, যেন কলেজ-জীবনের সেই তোমাকে ফিরে পেয়েছি—তখন আমি যেন প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের মুখে পড়লাম। অথচ বিস্ফোরিত সেই মুহূর্তে আমি আশ্চর্যভাবে স্থির হয়ে হয়ে গেলাম। আর নিয়তি নামে অলক্ষ্যচারিণীর দোহাই দিয়ে ভাবলাম, দেখি না নিয়তি আমাকে কোথায় নিয়ে যায়।

অলক্ষ্যচারিণী নিয়তি আমাকে ঠিকই পৌঁছে দিল নিষিদ্ধ গলির সেই দোতলার নির্দিষ্ট ঘরটিতে। আর অতনুও আমাকে অনুসরণ করে ঠিকই এসেছে।

আমি ফিরে এসেছি দেখে অনেকেই উঁকি-ঝুঁকি দিলে। আমার সঙ্গে কুমার চৌধুরী নয়, আর একজন পুরুষ এসেছে দেখে অনেকেই কৌতূহলী হলো। রীতা তো আমার ঘরের দরজায় পা দিয়েই বলে উঠলো, এ সোনার চাঁদ কোথায় পেলি রে মালা?

পিছু পিছু মুখরা এলাও এসেছে। বললে, কোথায় আবার—পুরীতে ঝিনুক কুড়োতে গিয়ে কুড়িয়ে পেয়েছে।

আমি যেন হারিয়ে ফেললাম নিজেকে। রীতা আর এলাকে দু-হাতে সরিয়ে দিয়ে সশব্দে বন্ধ করে দিলাম দরজা। ঝাঁপিয়ে পড়লাম অতনুর বুকে। খাটের ওপর বসেছিল অতনু, আচমকা আমার চাপে কাত হয়ে পড়লো। আমি তখন অতনুকে জড়িয়ে ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছি। অতনু আমার কান্নার গতি রোধ করলে না। বরং 'আমি একটা কিছু ভেবেছিলাম, কিন্তু এতটা ভাবিনি' বলে আমাকে আরো ভাসিয়ে দিলে।

বলতে দ্বিধা নেই, যখন আমি চোখের জলে ভাসছি, তখন আমার মধ্যে আর একটা মন আমাকে নতুন করে নরকের পথ দেখাতে চাইছে। আর অতনুর সুন্দর-সুঠাম দেহটার ওপরেই তার যেন লোভ। ওইটুকু পেলেই যেন সে তৃপ্ত হয়।

অতনুর কাছে আমার সেই মনটা ধরা পড়ে গেল। উঠে বসলো অতনু। আমাকে দু-হাতে সরিয়ে দিলে। তীব্র শ্লেষ মিশিয়ে

বললে, মালা, তুমি একেবারে শেষ হয়ে গেছ।

আমি আমার অস্তিত্ব-বিন্দুতে ফিরে এলাম। মুছে ফেললাম চোখের জল। তারপর অতনুর মুখের দিকে ফিরে চাই। কিন্তু চেয়ে থাকতে পারলাম না। হঠাৎ নিজেকে কেমন যেন শূন্য বোধ হলো। আর সেই শূন্যতার মধ্যেই আমি আবর্তিত হতে লাগলাম।

অতনুকে বলতে শুনলাম, আজ আমি যাই মালা।

কথাটা বলেই অতনু উঠে দাঁড়ালো। আমি তার মুখের দিকে লক্ষ্য করলাম। কিন্তু একটি কথাও বলতে পারলাম না। আমি যেন সব কিছুর খেই হারিয়ে বসে আছি।

অতনু চলে যাবে বলে পা বাড়িয়েছে, ছুটে গেলাম-আমি। দরজায় পিঠ রেখে পথরোধ করে দাঁড়ালাম। চাপা চীৎকার করে বললাম, তোমার যাওয়া হবে না অতনু।

অতনু হাসতে লাগলো।

বললাম, তুমি হাসছো অতনু? আমার জন্যে তোমার এতটুকু করুণা হচ্ছে না?

এবারে অতনুর হাসিটা আরো উচ্চগ্রামে পৌঁছলো। বললে, দরজা খুলে দাও মালা।

—না।

—না!

—হ্যাঁ, আমি তোমায় যেতে দেব না।

—যেতে তোমায় দিতে হবে মালা। অতনু মানুষটা যেন মুহূর্তে বদলে গেল। এগিয়ে এলো আমার কাছে। আমার চোখে চোখ রেখে বললে, কথা দিচ্ছি, আবার আসবো। আর তোমার জন্যেই আজ আমি চলে যাচ্ছি।

—আমার জন্যে। আমি সত্যিই বিস্মিত হলাম অতনুর কথায়। অতনু তার কথার জের টেনে বললে, তোমার জন্যেই আজ আমাকে চলে যেতে হবে—আমি মিথ্যে বলিনি মালা। আজ তুমি ক্লান্ত। দেহের সঙ্গে তোমার মনও। একটু বিশ্রাম তোমার একান্ত

প্রয়োজন। আমি এ-ও জানি মালা, আমার কোন কথা তুমি সহজ মনে নিতে পারবে না, তবু বলছি, আমি আবার আসবো।

আমি মনের দিক থেকে তখন শিথিল হয়ে পড়েছি। 'কবে আসবে' এ প্রশ্নটুকু করার শক্তিও আমার নেই।

—কথা দিচ্ছি মালা, আমি কাল সন্ধ্যের পর তোমার কাছে আসবো। তোমার কথা শুনবো—আজ সারাদিন, সারারাত, এমন কি কাল সারাটা দিন তোমার জন্যে রাখলাম, তুমি তোমার কথা ঠিক করে নাও, কি বলবে আমাকে।

তবু আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকাই অতনুর মুখের দিকে।

অতনু আমার একটি হাত তার হাতের মুঠোয় নিয়ে মৃদু চাপ দিলে। বললে, অতনু পাকড়াশীর ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো মালা, সে কখনো মিথ্যের আশ্রয় নেবে না। আজ আমি যাই—

আর কোন কথা নয়, আমি দরজার কাছ থেকে সরে এলাম। অতনু নিজের হাতেই দরজা খুললো। দরজার বাইরে পা বাড়িয়ে বললে, তুমি খুব রক্তগোলাপ ভালোবাসতে, না?

বলে আস্তে আস্তে চলে গেল অতনু। আমি কিছু সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে চার দেয়ালের মধ্যে নিজেকে বন্দী করলাম।

আমি কখনো নিজের কথা এমন করে ভাবতে চাই নি, কখনো ডুব দিতে চাইনি আপন হৃদয়-রহস্যে। কোনদিন এমন করে মনের গভীরে আপন অস্তিত্বকে আবিষ্কার করতে চাই নি।

আমার মধ্যে আমি মাধুকরী গ্রামের গ্রামের মেয়ে মালা বিশ্বাসের ছায়াটাকে যখন খুঁজতে গেলাম, তখনই মনে হলো সে মেয়ে যেন ফসিল হয়ে গেছে। তার ছায়া-অবয়ব আছে, কিন্তু প্রাণ-সত্তা নেই।

আমার কাছে জীবন কি নিতান্ত দুর্লভ? তা যদি হবে, তাহলে এমন করে ভাবতে পারছি কেন? যেখানে জীবন নেই, সেখানে চিন্তা-ভাবনা কিছুই নেই। আমি তো বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলিনি

আমি এখনো যুক্তি-তর্ক দিয়ে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে পারছি। এখনো তো বেশ আনন্দের সঙ্গে কল্পনা করতে পারছি, আগামীকাল সন্ধ্যের আগে কিংবা পরে কবি অতনু পাকড়াশী আমার জন্যে রক্তগোলাপ নিয়ে আসবে।

অতনু যখন আমার কাছে এসে রক্তগোলাপ হাতে নিয়ে দাঁড়াবে, তখন নিশ্চয়ই আমি তা দু হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করবো। আর সেই রক্তগোলাপের তোড়া হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই আমি মুহূর্তের জন্যে হলেও পূর্ণ হয়ে উঠবো। সেই মুহূর্তে ভেসে যাবো অনেক খুশীর বন্যায়।

মনে পড়ছে পুরনো কথা। কলেজের লাজুক প্রকৃতির ছেলে অতনু। আরো ছাত্র-ছাত্রীর ভিড়ে সে ছিল স্বতন্ত্র।

প্রথমটা অতনুই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। না, ঠিক বলা হলো না, বরং আমি অতনুর মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছিলাম, যার জন্যে আমি নিজে থেকেই তার সান্নিধ্য কামনা করেছিলাম। অতনুও খোলা মনে আমাকে 'বন্ধুত্ব' দিয়েছিল। কিন্তু জোনাকির আলো যতই মিষ্টি মনে হোক, উজ্জ্বল আলোর রোশনাইয়ে জোনাকি মিথ্যে হয়ে যায়। অতনুও একদিন ম্লান হয়ে গেল আমার চোখে। দীপক সান্যাল তখন আমার কাছে ধ্রুবতারার মত সত্যি।

তবু অতনু আমাকে ঘৃণা করলো না। সে তার সুন্দর মনের স্পর্শ আমার কাছে রেখে গেল।

মনে আছে, আমার আর দীপকের সম্পর্ক যখন নিবিড় তখন অতনুই একদিন আমাকে একগুচ্ছ রক্তগোলাপ দিয়ে বলেছিল, আমি কলেজ ছেড়ে চলে যাচ্ছি মালা—তুমি রক্তগোলাপ ভালোবাসো, তাই দিয়ে গেলাম।

সেদিনের ছবিটা আমার কাছে এখনো কত স্পষ্ট। সেই স্পষ্ট ছবিটার জন্যেই আমার দুচোখ জলে ভরে উঠলো। আর যেন ভাবতে পারছি না। আমার সব ভাবনা ভেসে যাক চোখের জলে।

দরজা খোলা ছিল। রীতা ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলো।

আমার চোখের জল শুকিয়ে গেলেও মুখের রেখা থেকে কান্নার রঙ মুছে যায়নি। রীতা ঘরে এলো, আমার পাশে বসলো, তবু কোন ভাবান্তর ঘটলো না। যেমন বসেছিলাম, তেমনি বসে রইলাম।

রীতা যেন আজ অন্য মেয়ে। বললে, তোর কি হয়েছে রে মালা ?

কথা না বলে চাপা নিশ্বাস ত্যাগ করলাম।

রীতা আমার পিঠে হাত রাখলো। আঙুল দিয়ে আলতোভাবে চাপ দিলে। আরো নিবিড় হয়ে বসলো আমার পাশে। কথা বললে না। গভীর নিশ্বাসের শব্দ পেলাম।

অন্যসময় হলে হয়তো রীতাকে সহ্য করতে পারতাম না। রীতা কেন, এ বাড়ির কোন মেয়েকে আমি মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারিনি। কিন্তু আজ আমার কারো সঙ্গে বিরোধ নেই। ওরাও যা, আমিও তাই। একই পরিচয় নিয়ে একই ঠিকানায় আছি।

রীতা বললে, আমি বুঝতে পেরেছি মালা—

বললাম, কি বুঝতে পেরেছ ?

রীতা বললে, এ বাড়িতে তুমি আর থাকবে না।

ফিরে চাইলাম রীতার মুখের দিকে। যে কথা আমি ভাবতে পারিনি, সে কথা ও কি করে ভাবলো ?

রীতা এবারে আমার একটা হাত টেনে নিলে। সে হাতটা নিয়ে রাখলো তার বুকের ওপর।

রীতার বুকের স্পন্দন অনুভব করলাম। তার বুকটা যেন থরথর করে কাঁপছে।

একবার মনে হলো জিজ্ঞাসা করি, রীতা তোর কি হয়েছে ? কিন্তু কথা বলতে যেন বাধলো।

রীতা বললে, জানো, কুমার চৌধুরী পরশুদিন সন্ধ্যেয় এ বাড়িতে এসেছিল।

—তারপর ?

কুমারের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

—আমাদের সবাইকে সে মিষ্টিমুখ করিয়ে গেছে। আর নীচের তলার খুশীদিকে হাজার টাকা দিয়ে গেছে চিকিৎসার জন্যে। খুশীদির অসুখটা খুব খারাপ—হয়তো বাঁচবে না।

—কি হয়েছে খুশীদির ?

—তার পেটের মধ্যে মরা বাচ্চাটা এখনো রয়েছে—হাসপাতালে গিয়ে পেট কাটাতে হবে।

—এখনো যায়নি হাসপাতালে ?

—কাল যাবে। রীতা বললে, জানো, খুশীদি একটা বাচ্চা চেয়েছিল।

কথার মধ্যে রীতার চোখ জলে ভিজে উঠেছে। আমি কিন্তু খুশীদির ব্যথাটাকে মনে মনে গ্রহণ করেও চোখের জল ফেলিনি। এমনকি একটি দীর্ঘশ্বাসও।

রীতা এবারে তুললো কুমারের প্রসঙ্গ। কুমার এসেছিল এ-বাড়িতে। সাধারণ মানুষের মত। আমাদের সকলের ঘরেই গেল। আর তোমার ঘর তো বন্ধই ছিল। আমরা সব অবাক হলাম তার ব্যবহারে। ভাবলাম, যে কুমারকে দেখেছি, সে তো এ কুমার নয়। এ যেন আর কেউ।

—তারপর ?

রীতা বললে, কুমারের কাছে জানতে চাইলাম তোমার কথা। সে কি বললে জানো—বললে, আজ আমার আরো আনন্দ হতো, যদি মালা আমার সঙ্গে থাকতো।

—আর কিছু বলেনি ?

—না। রীতা বললে, কতক্ষণই বা ছিল, ঘণ্টাখানেক—এরই মধ্যে হৈ হৈ করে চলে গেল।

এরপর আমিও নীরব। রীতাও কেমন যেন বোবা হয়ে বসে রইলো। একসময় জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁরে রীতা, আমি যদি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই ?

—আমি দুঃখ পাবো, কিন্তু—কথা শেষ করলো না রীতা।

—কি হলো ?

—কিছু না। রীতা বললে, যাক গে ওসব কথা, আমার কাছে তুমি টিয়ার খাঁচাটা গচ্ছিত রেখেছিলে, সেটা বরং দিয়ে যাই।

—থাক না, পাখিটা না হয় তোকেই দিলাম।

—কি করবো পাখি নিয়ে ? তার চেয়ে উড়িয়ে দাও।

সেইদিনই পাখিটাকে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু আকাশে ডানা মেলেও পাখিটা আবার বারান্দার রেলিংয়ে বসলো, কখনো ছাদের কার্নিশে, কখনো সামনের বাড়িটার চিলেকোঠার ছাদে। মুক্ত হবার পরেও ওর মন থেকে খাঁচার স্বপ্নটা হারিয়ে যায়নি।

কিন্তু পরের দিন পাখিটাকে আর দেখতে পেলাম না।

সকাল গেল, দুপুর কাটলো। এত সময় পর্যন্ত একটিবার চার দেয়ালের বাইরে আসিনি। বিকেলের দিকে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। দিনের বাকি সময়টুকু কতক্ষণে ফুরিয়ে যাবে। কখন রক্তগোলাপের তোড়া নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে অতনু।

বারান্দার ওধারে রীতা, এলা, হাসি আর চুমকি বসে গুলতানি করছে। এ বাড়ির মধ্যে চুমকিই একমাত্র অবাঙালী। তবে এখন বাঙালী মেয়েদের মত হয়ে গেছে। কথা না বললে ধরা যায় না।

এ বাড়ির পয়লা নম্বর আমি, আমার পরেই চুমকি। অন্যরা তাই তো বলে। আমি দেখতেও নাকি সুন্দরী, তার ওপর শিক্ষার পালিশটা আছে। আর চুমকি ? আমার চোখে চুমকিই এ বাড়ির সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। ও যদি দরজায় দাঁড়াতো, তা হলে সব অতিথির চোখ গিয়ে পড়ত ওর ওপর। কিন্তু দরজায় বড় একটা দাঁড়াতে হতো না চুমকির। আর দাঁড়ালেও যাকে তাকে ঘরে ঢুকতে দিত না। আধবুড়ো আর বুড়োগুলোকে দুচোখে দেখতে পারে না। বরং কচি-কাঁচা দেখলেই চুমকির চোখটা নেচে উঠতো।

একটা দিনের কথা। দিন নয়, রাতের কথা। রাত তখন

আটটা কি সাড়ে আটটা হবে। একটি ছেলে এলো এ বাড়িতে। কতই বা বয়েস হবে ছেলেটির। সতেরো কি আঠারো। আমি সাধারণত দরজায় দাঁড়াতাম না, কিন্তু সেদিন দাঁড়িয়ে ছিলাম। ছেলেটি আমাকে দেখলো, আমিও দেখলাম। আর দেখার মুহূর্তেই মনে হলো আমার ছোটভাইয়ের কথা। ছেলেটি আমার ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে আমিও।

ছেলেটি আমাকে দেখেই কেমন যেন ম্লান হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, ও এই প্রথম বেশ্যাবাড়ির চৌকাঠ মাড়িয়েছে। একবার ইচ্ছে হলো, জানতে চাই—এই কাঁচা বয়সে নারীদেহের নেশায় এখানে আসা কেন? কিন্তু পারলাম না। শুধু বললাম, তুমি চলে যাও ভাই।

ছেলেটি আমার মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু কথা বলতে পারলো না।

ছেলেটি বার বার খোলা দরজার দিকে তাকাতে লাগলো ভয়ে ভয়ে। বুঝতে পারলাম, ও চায় আমি দরজাটা বন্ধ করে দিই। কিন্তু দরজা বন্ধ করার কথা ভাবতেও পারি না। বরং ছেলেটিকে খোলা দরজা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, তুমি যাও লক্ষ্মীটি।

ছেলেটি তবু বসে রইলো।

এবারে একটু চড়া সুরেই বললাম, কেন বসে আছ এখানে, যাও।

আশ্চর্য। ছেলেটি আর বসলো না। আস্তে আস্তে চলে গেল বাইরে। গেল চুমকির ঘরের দিকে।

দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল চুমকি। ছেলেটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুটি যেন ধক্ করে জ্বলে উঠলো। ভ্রূ নাচিয়ে সর্বাঙ্গে ঢেউ তুলে দরজার বাইরে থেকেই ছেলেটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল ঘরে। বন্ধ হলো চুমকির ঘরের দরজা।

সে রাতে নয়, রাত-ভোরে দেখেছিলাম, ছেলেটি রুমালে চোখ মুছতে মুছতে চলে যাচ্ছে।

শুধু কি ওই একটা ঘটনা, এমন কত ঘটনা জড়িয়ে আছে এই নিষিদ্ধ গলির দৈনন্দিন জীবনে। যে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে আমরা। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। কামনা-সর্বস্ব নারী-পুরুষের লীলাভূমি এই নিষিদ্ধগলির এই ঘরটিতে আমিও ছিলাম অন্যতমা হয়ে—আজ সবটাই কেমন যেন অতীত মনে হচ্ছে। অথচ এই মুহূর্তে আমিও এখানে বর্তমান।

আমার ঘরে আজ চেনা অতিথি আসবে। অতনু পাকড়াশী। তার জন্যে প্রস্তুতি কই! একটু সাজতে হবে না? অন্তত একটা পাটভাঙা শাড়ি, হালকা রঙের ব্লাউজ—মাথার চুলটাও তো চিরুনি দিয়ে পরিপাটি করে নিতে হবে। মুখে প্রসাধনের প্রলেপ নাই-বা দিলাম, তবু দুই ভ্রূ-র মাঝখানে ছোট একটি রক্তিম বিন্দু আঁকতে ক্ষতি কি? অতনু কবি - তার দৃষ্টিটাও তো অন্যের মত নয়। নারীদেহের প্রতিটি রেখার ভাষা সে অন্য চোখে পড়তে চাইবে। মালার মধ্যে যে মালাকে সে দেখতে চাইবে, সে যদি তাকে দেখতে না পায়, হয়তো তার রক্তগোলাপের স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে যাবে।

অতনু যদি না আসে!

সে কথা আমি ভাবতেও পারি না। সে নিশ্চয়ই আসবে। সে না এলে তার সৃষ্টির স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর আমি? অস্তিত্ব হারিয়ে বিলুপ্তির শেষ বিন্দুতে পৌঁছবো।

শেষ অপরাহ্ণের আলো পড়েছে সামনের বাড়ির ছাদের কার্নিশে। এ বাড়ি ও বাড়ির পরিচয় একই। তবু ওরা যেন আমাদের চেয়ে কিছুটা অকুলীন। ও বাড়ির মেয়েরা এ বাড়ির মেয়েদের ঈর্ষার চোখে দেখে। মুখোমুখি হয়ে গেলে ভেংচি কাটে, কিংবা কোন নোংরা মন্তব্য শুনিয়ে দেয়। যে মন্তব্যের ভাষা অভিধানে নেই।

হঠাৎ গোটা বাড়িটাকে সচকিত করে তুললো আর্তকণ্ঠের চীৎকার। খুশীদি চীৎকার করছে।

একবার ভাবলাম, নীচে নেমে যাই। কিন্তু গেলাম না। দোতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে দেখলাম, গলির মুখে অ্যাম্বুলেন্স

দাঁড়িয়ে আছে। খুশীদিকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে।

দেখলাম, স্ট্রেচারে শুইয়ে খুশীদিকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো। আর খুশীদি সমানে চীৎকার করে চলেছে, আমি হাসপাতালে যাবো না, আমি মরে যাবো।

(এই নিষিদ্ধ-গলির মেয়ের মনেও বাঁচার ইচ্ছে।)

দেখতে দেখতে অ্যাম্বুলেন্সটা বেরিয়ে গেল। হারিয়ে গেল খুশীদির আর্তকণ্ঠের চীৎকার।

অপরাহ্নের আলোর রঙ মুছে গেছে। সন্ধ্যা না হলেও সন্ধ্যার আভাস। এলা, চুমকি, রীতা ওরা সাজগোছ করতে ঘরে গেছে। আরো যারা তারাও।

চায়ের দোকানের ছেলেটা চা নিয়ে আসছে। সন্ধ্যেবেলা ও ঘরে ঘরে চা দিয়ে যায়। এবারে বাড়িওয়ালা মাসিও একবার দেখা দিয়ে যাবে। মুখরা মাসি, তার কথা শুনলেই গা জ্বলে যায়। মাসিকে কেউ দেখতে পারে না, অথচ মাসিকে সমীহ করে চলা ছাড়া উপায় নেই। যাই হোক, এ বাড়িতে সুখে দুঃখে মাসি।

—হ্যাঁরে, মুখপুড়ি, মাসির ঘ্যানঘেনে গলা শুনতে পেলাম, অমন বাবুটির মাথা বিগড়ে দিলি কেন ?

মাসি বলছে কুমার চৌধুরীর কথা।

কথা বাড়াতে ইচ্ছে নেই। 'শরীর খারাপ—পরে বলবো' বলে মাসিকে এড়িয়ে গেলাম। তবু দু'কথা শুনিয়ে যেতে ছাড়লো না মাসি।

মাসির কথা পাশের ঘরের চাঁদুর কানে গেছে। সে তো শুধু সায়া পরেই বেরিয়ে এলো ব্লাউজটা হাতে নিয়ে। বললে, কি রে মালা, সত্যি নাকি ?

—যা, ঘরে যা।

—বেশ্যার আবার পীরিত, বলে চাঁদু তার আলগা বুক নাচিয়ে চলে গেল।)

সামনের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল ক'টি মেয়ে, চাঁছুর ঢং দেখে তারা সমস্বরে হেসে উঠলো। এ বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল যারা, ও বাড়ির মেয়েদের উদ্দেশ্যে তারা খিস্তি আওড়ালো। ও বাড়ির মেয়েরাও কম যায় না, তারাও নানা রকম নোংরা কথা ছুঁড়ে দিল এ বাড়ির মেয়েদের কানে।

আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়, নিজের মান নিজের কাছে। ওরা যা খুশি বলছে বলুক, আমি ততক্ষণ ঘরে গিয়ে অতনুর জন্যে তৈরী হই।

সামনের দরজা আলগা ভাবে ভেজানো রইলো। একবার মনে হলো বন্ধ করে দিই। কিন্তু বন্ধ দরজা দেখলে যদি সে ফিরে যায়। দরজা বন্ধ দেখলে সে তো অন্য কিছু ভাবতে পারে।

ঘরের ভিতর দিয়েই বাথরুমে যাওয়া যায়। সাবান তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। হাতে মুখে সাবান দিয়ে নিজেকে যতটুকু পরিষ্কার করার—করলাম। তারপর কাপড়-চোপড় বদলে নিলাম।

আজ সাধারণ মেয়ের মতই সেজেছি। হালকা রঙের সিল্কের শাড়ি, রঙ মিলিয়ে ব্লাউজ, তারপর ঢিলে বিনুনী করে আলগা খোঁপায় চুলটাও জড়িয়ে নিয়েছি। এবারে মুখে সামান্য পাউডারের প্রলেপ দিয়ে কপালে একটি ছোট্ট টিপ আঁকা। টিপ আঁকতে গিয়ে আঙুলটা যেন কেঁপে গেল। বেঁকে গেল টিপটা। তোয়ালেয় মুছে সযত্নে একটি ছোট বিন্দু দিলাম দুই ভ্রূ-র মাঝখানে। তারপর আরশির কাছ থেকে সরে এসে নিজেকে দেখলাম।

হঠাৎ সচকিত হলাম দরজার পাল্লাটা সরে যেতে। না—যাকে দেখতে চাই, সে নয়। আর একজন।

—ভিতরে আসতে পারি? লোকটি এত মদ খেয়েছে, যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

—না।

—না কেন?

—বলছি তো না।

—বুঝেছি, লোকটি দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলো। বললো, তোমার দাম বুঝি বেশী? তা কত দাম দিতে হবে? একশো, দুশো—নাকি তারও বেশী?

—আপনি যান।

—যাবো বলে তো এখানে আসিনি। বেশ তো, কত চাই বল না - যা চাইবে তাই পাবে। তবে একটা কথা, তুমিও যেমন দাম নেবে, আমিও তা তোমার কাছ থেকে সুদে-আসলে পুষিয়ে নেব।

লোকটিকে এবারে ভালো করে দেখলাম। এ বাড়িতে যাদের যাতায়াত এ তাদের কেউ নয়। আমি তো এর আগে একে দেখিনি। বাইরেটা তো দস্তুরমত ভদ্রলোকের মত—দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।

—কি দেখছ? আমাকে? লোকটি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করতে গেল। আমি বাধা দিয়ে বললাম, আপনি যান—আমার বাঁধা বাবু আছে, তার আসার সময় হলো।

—আরে ছোঃ, তোমার বাঁধা বাবুটি তো শিকল ছিঁড়ে পালিয়েছে, আমি কিছু জানি না ভেবেছ—হাঁ করে দেখছো কি, তোমার কুমার চৌধুরীর কথা বলছি। আমি কুমারকেও চিনি, তোমাকেও চিনি মালা।

সর্বাঙ্গ রি রি করে জ্বলে উঠলো। ইচ্ছে হলো চীৎকার করে সুখলালকে ডাকি। সুখলাল এ বাড়ির পাহারাদার—তাকে ডেকে লোকটিকে জোর করে বার করে দিই। কিন্তু তাতে আরো কেলেঙ্কারী বাড়বে। একটা সোরগোল পড়ে যাবে। আর তার মধ্যে যদি অতনু এসে দাঁড়ায়, তাহলে একটা বিশ্রী ব্যাপার হবে। তার চেয়ে লোকটিকে অন্যভাবে সরিয়ে দিই।

—কি ভাবছো? আমি তোমাকে চিনলাম কি করে? তোমার মনে নেই, একবার কুমার তোমাকে নিয়ে আমার বাগানবাড়িতে গিয়েছিল? কী, মনে পড়ছে?

মনে পড়লো বছর চারেক আগের কথা। কুমার একদিন আমাকে নিয়ে মধ্যমগ্রামে একটা বাগানবাড়িতে গিয়েছিল। এবারে

সবই মনে পড়ছে, এই লোকটিই সেই বাগানবাড়িতে একটি ফিরিঙ্গি মেয়েকে নিয়ে থাকতো। মনে আছে সেই নারকীয় রাতটির কথা। লোকটি মাতাল হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল, তখন বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল কুমার। ডাকতেও সে আমার ইজ্জত বাঁচায়নি। শেষটা ফিরিঙ্গি মেয়েটাই ওই পশুটার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছিল।

—মনে পড়ছে মালা, লোকটি এবারে মুখে একরকম বিশ্রী শব্দ করে বললে, আমার বাগানবাড়ি খাঁ খাঁ করছে, তোমাকে সেখানে রাখবো। আমার সে ফিরিঙ্গি চিঁড়িয়া হাওয়া হয়ে গেছে।

বলেই লোকটি আমার একটা হাত চেপে ধরলো।

—আঃ, ছাড়ুন।

—না।

—আপনি কি চান সুখলাল আপনার গলা-ধাক্কা দিয়ে বার করে দিক?

—ছাখো মালা, বেশ্যা ছুঁড়িদের মন আমি বুঝি—সে তো তোমায় বলেছি, অবিনাশ হাজরা তোমার ন্যায্য দামই দেবে।

—আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো?

—এখানে আবার ভাববার কি আছে। তুমি তো আর সতীলক্ষ্মী নও যে, ভাবতে হবে। খাতায় নাম লিখিয়ে রূপের ব্যবসা করছো, আমি তোমার খদ্দের, রূপ-যৌবন কিনতে এসেছি, তবে হ্যাঁ, দামে না পোষায় আমি চলে যাবো—

হঠাৎ কি মনে হলো, বলে বসলাম—দিতে পারবেন আমার দাম, একটা রাতের দাম—

কথা শেষ করতে পারলাম না। মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল। সরে গেল পায়ের নীচের মাটি। তারপর কি হয়েছে জানি না, যখন চোখ মেলে তাকালাম, দেখলাম আমার মাথার কাছে বসে রীতা। আর অতনু খাটের একান্তে বসে আছে।

সবকিছু স্বপ্নের মত মনে হলো। স্বপ্ন যদি ভেঙে যায়। বন্ধ করলাম ছুটি চোখ।

—মালা।

অতনু আমার নাম ধরে ডাকছে।

—মালা। রীতা আমাকে ডাকছে।

আবার দু চোখ মেলে চাইলাম অতনুর দিকে। অতনু একগুচ্ছ রক্তগোলাপ আমার দিকে এগিয়ে দিলে। হাত পেতে নিলাম সেই সুন্দর গোলাপগুলো।

—কেমন, পছন্দ হয়েছে তো?

গোলাপের গুচ্ছ বুকে চেপে ধরলাম। আমার দেহ-মন জুড়ে তখন এক অনাস্বাদিত আনন্দ-শিহরণ। সেই আনন্দের মধ্যে আমি হারিয়ে গেলাম। কি করবো, কি বলবো, কিছুই ভেবে পেলাম না।

রীতা উঠে দাঁড়ালো। 'আমি এখন যাচ্ছি মালা' বলে আস্তে আস্তে চলে গেল। যাবার আগে বন্ধ করে দিয়ে গেল দরজা।

অতনু এবারে আমার চিবুক স্পর্শ করলো। আমার চোখে চোখ রেখে বললে, এবারে যেতে হবে মালা।

—না, না, চলে যাবে কেন?

—আমার সঙ্গে তুমিও যাবে মালা।

—কোথায়?

—উত্তরপাড়ায় গঙ্গার ধারে ছোট্ট একটি বাড়ি করেছি, এতদিন একাই ছিলাম, এখন থেকে তুমিও থাকবে।

অতনুর একটি হাত আমি বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম। কিন্তু কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারলাম না।

—এখানে যা কিছু আছে সব পড়ে থাক, শুধু তুমিই চলো মালা।

—আমি!

(অতনু দু-হাতে স্পর্শ করলো আমার চিবুক। আমার দু'চোখে তখন তার স্থির প্রতিবিম্ব। অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে তাকে বলতে শুনলাম, মালা, আমার কাছে তুমি আজও রমণী।)

কোথায় যেন হারিয়ে গেলাম সেই মুহূর্তে। একটা নিকষ-কালো অন্ধকার আমাকে আচ্ছন্ন করলো। আর তারই মধ্যে শুনতে পেলাম অতনুর কণ্ঠস্বর। সে আমার নাম ধরে ডাকছে।